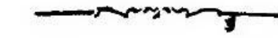
বঙ্গদর্শন।



সোনার বাংলা।



বাউলের সুর।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী॥
ওমা ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে, (মরি হায় হায় রে)।
ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
কি দেখেছি মধুর হাসি॥

কি শোভা কি ছায়া গো,
কি স্নেহ কি মায়া গো,
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে
নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে
লাগে সুধার মত (মরি হায় হায় রে)—
মা, তোর বদনখানি মলিন হ'লে
আমি নয়নজলে ভাসি॥

তোমার এই খেলাঘরে
শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি
ধন্য জীবন মানি।

তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে
কি দীপ জ্বালিস্ ঘরে (মরি হায় হায় রে)—
তখন খেলাধূলা সকল ফেলে
তোমার কোলে ছুটে আসি॥

ধেনু-চরা তোমার মাঠে,
পারে যাবার খেয়াঘাটে,
সারাদিন পাখি-ডাকা ছায়ায় ঢাকা
তোমার পল্লিবাটে,—
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে
জীবনের দিন কাটে (মরি হায় হায় রে)—
ওমা আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল তোমার চাষী॥

ওমা তোর চরণেতে
দিলেম এই মাথা পেতে
দেগো তোর পায়ের ধূলো সে যে আমার
মাথার মাণিক হবে।
ওমা গরীবের ধন যা আছে তাই
দিব চরণতলে (মরি হায় হায় রে)
আমি পরের ঘরে কিনব না তোর
ভূষণ বলে' গলার ফাঁসি॥

রামায়ণের রচনাকাল।

শব্দবিচার।

"ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে।
শিক্ষা ঘ্রাণন্তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"

বেদার্থ অবগত হইতে হইলে, ষড়ঙ্গে ব্যুৎপত্তিলাভ আবশ্যক। ছন্দ বেদের পদদ্বয়; কল্প হস্তদ্বয় বলিয়া কথিত; জ্যোতিষ চক্ষু; নিরুক্ত কর্ণ, শিক্ষা ঘ্রাণ; ব্যাকরণ মুখ। অতএব ষড়ঙ্গে ব্যুৎপত্তিলাভ না করিলে, বেদার্থে ব্যুৎপত্তিলাভ করা অসম্ভব। এইজন্য পুরাকালে ষড়ঙ্গের অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় বিশেষ আড়ম্বর ছিল।

বেদমন্ত্রের যথাযথ-উচ্চারণ-শিক্ষার্থ শিক্ষাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ আবশ্যক; অন্যথা অর্থবোধ দূরে থাকুক, বেদমন্ত্রের আবৃত্তি পর্য্যন্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে। মন্ত্রগুলির যথাযথ আবৃত্তি করিবার জন্য শিক্ষাশাস্ত্রের ন্যায় ছন্দঃশাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি আবশ্যক। কল্পশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ না করিলে, বেদমন্ত্রের প্রয়োগজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বেদবাক্যের অর্থনির্ব্বচনের জন্য "নিরুক্ত," ব্যুৎপত্তি-বিজ্ঞানের জন্য "ব্যাকরণ" এবং বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের কালনির্ণয়ের জন্য "জ্যোতিষ" অধ্যয়ন করিতে হয়। সুতরাং যে যুগে বৈদিকশিক্ষা প্রবল ছিল, সে যুগে ষড়ঙ্গের অধ্যয়ন-অধ্যাপনাও প্রচলিত থাকিবার কথা। কালক্রমে ধীরে ধীরে সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া পড়িতেছে!

সংস্কৃতশব্দের পুরাতন উচ্চারণরীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হইলে, উচ্চারণরীতির অভ্যাস করিতে হইত। লৌকিকসাহিত্য পাঠ করিবার সময়ে,—এমন কি, শিক্ষিতসমাজের কথোপকথনসময়েও,—সে অভ্যস্ত উচ্চারণরীতি পরিত্যক্ত হইত না। তাহা বিলুপ্ত হইবার পর হইতে, "উদাত্তানুদাত্তস্বরিত"-ভেদে উচ্চারণভেদ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে; পুরাতন ব্যাকরণে সে বিষয়ে যে সকল বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, আধুনিক ব্যাকরণ হইতে তাহাও দূরীভূত হইয়া গিয়াছে।*

কোন্ সময় হইতে পুরাতন উচ্চারণরীতি বিলুপ্ত হইয়া গেল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। পাণিনিযুগে,—কাত্যায়নযুগে,—পতঞ্জলিযুগে,—খৃষ্টাবির্ভাবের পূর্ব্বকালবর্ত্তী সমস্ত সাহিত্যযুগেই তাহা প্রচলিত ছিল। তাহার পর বৈদিকসাহিত্যালোচনার শিথিলতা উপস্থিত হইলে, পুরাতন উচ্চারণরীতি ক্রমশ বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে।

রামায়ণের রচনাকালে শিক্ষিতসমাজের কথোপকথনেও পুরাতন উচ্চারণরীতি প্রচলিত ছিল। এক্ষণে বেদাঙ্গের মধ্যে একমাত্র ব্যাকরণেরই যাহা-কিছু আলোচনা প্রচলিত আছে; অন্যান্য বেদাঙ্গের আলোচনা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর পুরাতন উচ্চারণরীতি প্রচলিত নাই।

ভরত যখন ভরদ্বাজের আশ্রমে আতিথ্য-স্বীকার করেন, তখন অশেষতপঃপ্রভাব-সম্পন্ন ভরদ্বাজ নানারূপে ভরতের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। কথোপকথনেও তাঁহার "শিক্ষা-স্বর-সমাযুক্ত" বাক্য উচ্চারণ করিবার কথা অযোধ্যাকাণ্ডে লিখিত আছে। যথা,—

"এবং সমাধিনা যুক্তস্তেজসাঽপ্রতিমেন চ।
শিক্ষাস্বরসমাযুক্তং সুব্রতশ্চাব্রবীন্মুনিঃ॥" ২।৯১।২২

তৎকালে শিক্ষিতসমাজে শিক্ষাশাস্ত্রোক্ত উচ্চারণরীতি সুপরিচিত না থাকিলে, গৃহীর সহিত কথোপকথনকালে শিক্ষাস্বরসমাযুক্ত বাক্য উচ্চারিত হইবে কেন? রামায়ণের রচনাকালে লোকশিক্ষার্থ যে সকল শাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে ষড়ঙ্গ বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। যথা,—

"নাষড়ঙ্গবিদত্রাসীৎ নাব্রতো নাবহুশ্রুতঃ॥" ১।১৪।২১

রামায়ণ পাঠ করিয়া তাহার আভ্যন্তর

* রামায়ণের "ছন্দোবিচারে" প্রবৃত্ত হইবার সময়ে এই কথা বিশেষভাবে আলোচিত হইবে। বৈদিক-সাহিত্যের ন্যায় লৌকিকসাহিত্যেও এক সময়ে স্বরসংযোগে পাঠ করিবার রীতি ছিল। তখনও আধুনিক ছন্দ প্রচলিত হয় নাই।

মর্ম্মগ্রহণ করিতে হইলে, ষড়ঙ্গের শরণাপন্ন হইতে হয়; নচেৎ অনেক কথাই বুঝিতে পারা যায় না। এই সকল কারণে দেখিতে পাওয়া যায়,—রামায়ণের রচনাকালে বৈদিক-শিক্ষা পূর্ণপ্রতাপেই প্রচলিত ছিল।

কালপ্রভাবে কেবল উচ্চারণরীতিই পরিবর্ত্তিত হয় নাই। শব্দের ব্যুৎপত্তিও নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ব্যাকরণশাস্ত্র প্রচলিত শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, এই সকল পরিবর্ত্তনের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে।

শব্দসকল ত্রিধা বিভক্ত হইতে পারে;—বৈদিক, লৌকিক ও লৌকিক-বৈদিক। এই শ্রেণীবিভাগও ক্রমে কত পরিবর্ত্তনের অধীন হইয়াছিল। যাহা পাণিনিযুগে কেবল বৈদিক বলিয়াই পরিচিত ছিল, উত্তরকালে সেরূপ অনেক শব্দ লৌকিকসাহিত্যেও ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহা লৌকিক-বৈদিক উভয় সাহিত্যে ব্যবহৃত হইত, সেরূপ কত শব্দ আর লৌকিকসাহিত্যে ব্যবহৃত হয় নাই! এই শ্রেণীর শব্দবিচার জটিলাকারে প্রতিভাত হইয়া পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি সংঘটিত করিতে পারে; তাহার কথা আপাতত উল্লিখিত হইবে না। আপাতত কেবল ব্যুৎপত্তিগত শব্দবিচারে প্রবৃত্ত হইলেই যথেষ্ট হইবে।

বিশ্বামিত্র-ঋষি দশরথের নিকট উপনীত হইয়া, যজ্ঞবিঘ্ন নিবারণ করিবার আশায় রামচন্দ্রকে যুদ্ধার্থ তপোবনে লইয়া যাইবেন বলিয়া প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। দশরথ বলিয়াছিলেন,—রামচন্দ্র ঊনষোড়শ-বর্ষবয়স্ক,—বালক বলিলেই হয়,—এখনও তাহার শস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হয় নাই। অক্ষৌহিণী সেনা প্রেরণ করিলে কি হয় না? ঋষি কহিলেন,—না। দশরথ স্বয়ং যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ঋষি কহিলেন,—না না। তখন অনন্যোপায় হইয়া দশরথ পুত্রসমভিব্যাহারে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ঋষি কহিলেন,—না। এইরূপে পুনঃপুন প্রত্যাখ্যাত হইয়া, দশরথ অবশেষে দৃঢ়স্বরে কহিলেন—

"বালং মে তনয়ং ব্রহ্মন্! নৈব দাস্যামি পুত্রকম্।"

'হে ব্রহ্মন্! আমার বালক "তনয় পুত্রকে" দান করিতে পারিব না।' এই শ্লোকার্দ্ধে "তনয়" এবং "পুত্রক" এই দুইটি শব্দ যুগপৎ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা কি মহাকবির রচনাদোষ? অথবা এই দুইটি শব্দের যুগপৎ ব্যবহারের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে? শব্দবিচার না করিলে, তাহার মীমাংসা করা যায় না।

রামায়ণের টীকাকার তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া, এই শ্লোকার্দ্ধের (তনয় পুত্রক) পুনরুক্তিদোষ পরিহার করিবার জন্য আলঙ্কারিক বিচারের অবতারণা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—

"অতিদুঃখিতত্বাৎ পৌনরুক্ত্যং ন দোষঃ।"

এই সিদ্ধান্ত বিচারসহ বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে মহাকবির রচনা প্রথমে দোষাবহ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে; পরে বিশেষ কারণে দোষক্ষালনের চেষ্টা হইয়াছে। সেই বিশেষ কারণটি বিচারসহ না হইলে, দোষ দোষই থাকিয়া যাইবে। এইরূপে প্রথমে দোষ কল্পনা করিয়া, তাহার পর দোষক্ষালনের

চেষ্টা না করিয়া,—আদৌ কোনরূপ "পুনরুক্তি" আছে কি না, তাহার বিচার করিলেই ভাল হইত।

"অতিদুঃখিতত্বাৎ পৌনরুক্ত্যং ন দোষঃ।"

ইহার প্রথম কথাটি—মূল কারণটি—সঙ্গত হইলে, শেষ কথাটি—টীকাকারের সিদ্ধান্তটি—অবশ্যই সুসঙ্গত হইবে। কিন্তু দশরথ যখন এই বাক্যের উচ্চারণ করেন, তখন তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ? তাহা কি তখন দুঃখভারে অবনত? আদ্যন্তের সহিত ভাবসামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, এই আখ্যায়িকা পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—মহর্ষির শুভাগমনে দশরথ প্রথমে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন; সংস্কারবশত অত্যন্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছিলেন,—

"অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্।"

ইহা শিষ্টাচারবিজ্ঞাপক অভ্যর্থনামাত্র। বিশ্বামিত্র তাঁহার আগমনের প্রয়োজন ব্যক্ত করিবামাত্র, এই শিষ্টাচার তিরোহিত হইয়া গেল! সহসা সংজ্ঞাহীন হইয়া, আবার সংজ্ঞালাভের পর, দশরথ শোকাবিষ্ট হইলেন;—বিচলিত হইলেন;—মোহপ্রাপ্ত হইলেন; অবশেষে নিতান্ত ভয়ান্বিত হইয়া, বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন!

"শোকেন মহতাবিষ্টশ্চচাল চ মুমোহ চ।
লব্ধসংজ্ঞস্ততোত্থায় ব্যষীদত ভয়ান্বিতঃ।

প্রথমে মূর্চ্ছা, তাহার পর সংজ্ঞালোপ! তাহার পর শোক,—চাঞ্চল্য,—মোহ,—অবশেষে ভয়ান্বিত বিষণ্ণতা,—পর্য্যায়ক্রমে দশরথকে অভিভূত করায় প্রথমে তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। ক্রমে ভয় দূর হইলে, প্রত্যুত্তরদানের সাহস হইল;—শোক নিরস্ত হইলে, উত্তরদানের জন্য কণ্ঠরোধ বিদূরিত হইল;—চাঞ্চল্য সংযত হইলে, মোহ অপগত হইল;—বিষণ্ণতা বশীকৃত হইয়া, দশরথকে প্রত্যুত্তরদানের জন্য প্রগল্‌ভ করিয়া তুলিল! তিনি বিশিষ্ট বাগ্মীর ন্যায় বহুবাক্যে বিশ্বামিত্রকে শান্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; সুবিজ্ঞ নৈয়ায়িকের ন্যায় বহু তর্কে বিশ্বামিত্রকে বুঝাইতে বসিলেন; যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখনই কেবল বলিতে বাধ্য হইলেন—

"বালং মে তনয়ং ব্রহ্মন্! নৈব দাস্যামি পুত্রকম্।" *

মানবচরিত্রতত্ত্বজ্ঞ সমালোচকগণ দশরথের মানসিক অবস্থার সমালোচনা করিয়া এই শেষবাক্য উচ্চারণ করিবার সময়ে দশরথকে নিরতিশয় দুঃখভারাক্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে না পারিলে, পুনরুক্তিদোষ মহাকবির রচনাদোষ বলিয়াই ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইবেন! ইহা আদৌ রচনাদোষ কি না, তাহার বিচার না করিয়া, ইহাকে প্রথমে রচনাদোষ বলিয়া ধরিয়া লইয়া, তাহার পর "অতিদুঃখিতত্বাৎ" বলিয়া আর একটি অনুমানের আশ্রয়গ্রহণ করিয়া মহাকবিপ্রয়োগের সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। ইহা কি আদৌ পুনরুক্তিদোষের দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইবার যোগ্য? তাহার মীমাংসা

* "নৈব" এই নিশ্চয়াত্মক নিষেধবাক্যে দশরথের সুদৃঢ় সঙ্কল্প ব্যক্ত হইতেছে। ইহার সহিত দুঃখাতিশয্যের সংস্রব থাকিতে পারে না।

"পুত্রক-"শব্দের বিচারের উপরে নির্ভর করিতেছে।

পুত্র কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের সহিত ভারতবর্ষের বহু বিলুপ্তকাহিনী সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহার তথ্যানুসন্ধানের জন্ত বঙ্গসাহিত্যেরও আগ্রহ উপস্থিত হইবার কারণ আছে। পুত্র কোন্ শ্রেণীর শব্দ? ইহা কি "ব্যুৎপন্ন"—অথবা "অব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিক"?

এ বিষয়ে মতপার্থক্যের অভাব নাই! উণাদিকারগণ অন্তান্ত "অব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিকের" ন্তায় পুত্রশব্দেরও একটি ব্যুৎপত্তি-নির্দ্দেশের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। অথচ বৈয়াকরণগণ পুত্রশব্দকে "অব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিক" বলিয়া কুত্রাপি ব্যক্ত করেন নাই!

পুত্রশব্দ সুপরিচিত হইলেও, তাহার একটি ভিন্ন অন্তান্ত ব্যুৎপত্তি সুপরিচিত বলিয়া বোধ হয় না। যে ব্যুৎপত্তি সুপরিচিত, তাহা পুত্রকে "পুন্নাম-নরকত্রাতা" বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। এই ব্যুৎপত্তির ইতিহাস আলোচনার পূর্ব্বে, তর্কস্থলে ইহাকেই পুত্রশব্দের একমাত্র ব্যুৎপত্তি বলিয়া ধরিয়া লইলেও, পুনরুক্তিদোষ নিরাকৃত হয় না। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে পুত্র,—জন্মগ্রহণমাত্রেই,—পিতাকে পুন্নাম-নরক হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে; সুতরাং রামচন্দ্রের যাহা করিবার, তাহা জন্মগ্রহণমাত্রেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার যুদ্ধক্ষেত্রে অকস্মাৎ মৃত্যু সংঘটিত হইলে, দশরথের শোক ভিন্ন পারলৌকিক ক্ষতির আশঙ্কা ছিল না। এরূপ অবস্থায় "তনয়" এবং "পুত্রক" শব্দের যুগপৎ ব্যবহারের সার্থকতা সুব্যক্ত হইতে পারে না।

পুত্রশব্দের পুরাতন ব্যুৎপত্তি অপ্রচলিত হইলেও, সংস্কৃতসাহিত্য হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এই শব্দ বহু পুরাতন;—বৈদিকসাহিত্যেও সুপরিচিত। ইহার অনেক প্রতিশব্দ প্রচলিত আছে। কিন্তু কোন প্রতিশব্দেই পুত্রশব্দের বিশেষ অর্থ প্রতিভাত হয় না। সূনু, সন্তান, তনয়, নন্দন ইত্যাদি প্রতিশব্দ কেবল জন্মগত অর্থ প্রকাশিত করে। সূনু প্রসূত ব্যক্তি;—এই শব্দে অন্ত কোন ভাব প্রকাশিত হয় না। সন্তান ও তনয় বংশবিস্তারকারক;—তাহারা অন্ত কোন ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না। নন্দন কেবল আনন্দদাতা,—অন্ত ভাব প্রকাশ করিতে অসমর্থ। এই সকল শব্দ একএকটি বিশেষ ভাব ব্যক্ত করিয়া, কেবল তাহারই বিশেষ প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে। পুত্রশব্দও এইরূপ একটি-না-একটি বিশেষ ভাব ব্যক্ত করিবার জন্তই ব্যবহৃত হইত। তাহাতে অন্ত কোন ভাব ব্যক্ত হইত না; অন্ত কোন শব্দেও তাহার বিশেষ কার্য্য সাধিত হইতে পারিত না। সে ভাবটি কি? তাহা বৈদিক-সাহিত্যেই অভিব্যক্ত।

বৈদিকযুগ আর্য্যসমাজের পরম কল্যাণাবহ বিজয়যুগ। সে যুগের আর্য্য-সমাজ বিবিধ বিজয়সাধনের জন্তই নিরত উদ্যমশীল ছিল। সকলেই তজ্জন্ত হইয়া বিবিধ বিজয়সাধনের আশায় কায়মনোবাক্যে নিয়ত তপশ্চরণ করিতেন। তজ্জন্ত বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান প্রচলিত হইয়াছিল। রাজ্যরক্ষা,

ধর্ম্মরক্ষা, আচাররক্ষা,—রাজ্যজয়, শত্রুজয় সমরবিজয়,—ইত্যাদি ব্যক্তিমাত্রেরই প্রাণপণে তপস্যা করিবার দায়িত্ব ছিল। প্রত্যেক কর্ম্মানুষ্ঠানে এই দায়িত্ব স্পষ্টাক্ষরে পুনঃপুন কীর্ত্তিত হইত; প্রত্যেক আহুতি এই দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দিত; প্রত্যেক মন্ত্রে এই দায়িত্বের কথাই নানাভাবে ধ্বনিত হইয়া উঠিত। এইরূপ একটি দায়িত্ববিজ্ঞাপক কর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত পুত্রশব্দের পুরাতন ব্যুৎপত্তি সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহার কথা "বৃহদারণ্যক"-উপনিষদে অদ্যাপি উল্লিখিত আছে।

অথ ত্রয়ো বাব লোকাঃ।
মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি।
সোঽয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণৈব জয্যো নান্যেন কর্ম্মণা।
কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকঃ।

'তিনটিমাত্র লোক;—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক, দেবলোক। তন্মধ্যে এই যে মনুষ্যলোক, ইহা কেবল "পুত্রের" দ্বারাই জিত হইতে পারে; কোনরূপ অন্য কর্ম্মানুষ্ঠানে জিত হইতে পারে না। কর্ম্মের দ্বারা পিতৃলোক, বিদ্যার দ্বারা দেবলোক জিত হয়।' এই বেদবাক্যে বৈদিকযুগের আর্য্যসমাজের মত ও বিশ্বাস স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়া রহিয়াছে।

পুত্রের সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোনরূপ পারলৌকিক কল্যাণসাধন করিবার কথা এই বেদবাক্যে উল্লিখিত হয় নাই;—পুত্র কেবল মনুষ্যলোক জয় করিবার সহায়। পক্ষান্তরে, "পুন্নামনরকত্রাতা" বলিয়া পুত্রশব্দের যে ব্যুৎপত্তি সুপরিচিত, তাহাতে মনুষ্যলোক জয় করিবার প্রসঙ্গ নাই; তাহাতে কেবল পারলৌকিক কল্যাণসাধনের কথা। দুইটি ব্যুৎপত্তি দুইটি বিভিন্ন মত ও বিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করিতেছে!

"অথাতঃ সংপ্রত্তির্যদা প্রৈষ্যন্ মন্যতেঽথ পুত্রমাহ ত্বং ব্রহ্ম ত্বং যজ্ঞস্ত্বং লোক ইতি। স পুত্রঃ প্রত্যাহ অহং ব্রহ্ম অহং যজ্ঞোঽহং লোক ইতি।"

মনুষ্য যখন অরিষ্ট-লক্ষণে আপনার মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী বলিয়া বুঝিবে, তখন তাহাকে "সংপ্রত্তি"নামক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সে পুত্রকে কহিবে—"তুমি আমার অসমাপ্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিও।" পুত্র কহিবে—"অবশ্যই করিব।" এইরূপে পুত্রহস্তে অসমাপ্ত কার্য্যভার সমর্পণ করিবার কর্ম্মানুষ্ঠান প্রচলিত হইয়াছিল। এই কর্ম্মানুষ্ঠানে যথাশাস্ত্র প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, পিতার কর্ত্তব্যপালনের ছিদ্র পূরণ করিয়াই পুত্র "পুত্র"-নামে কথিত হইতেন। আত্মজমাত্রেই এই গৌরবের উপাধি গ্রহণ করিতে পারিতেন না; ইহা কেবল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিদ্রপূরণকারীকেই "পুত্র" বলিয়া ঘোষণা করিত। আত্মজের অভাবে অন্য কেহ—দত্তক, কৃত্রিম, পুত্রিকাপুত্র—"পুত্র" হইতে পারিতেন। একজন না একজনকে এইরূপে অসমাপ্ত কর্ত্তব্যভার সমর্পণ করিতে হইত; কেহই লোকজয়ের কার্য্য বিস্মৃত হইয়া, ইহলোক পরিত্যাগ করিতেন না!

এই বেদবাক্যের ব্যাখ্যায় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন, এই কর্ম্মানুষ্ঠানের বিবরণের মধ্যেই পুত্রশব্দের নির্ব্বচন—নিরুক্ত—ব্যাখ্যা—প্রাপ্ত হওয়া যায়। *

* পূরণেন ত্রায়তে স পিতরং যস্মাৎ তস্মাৎ পুত্রো নাম।—ইতি শাঙ্করভাষ্যম্।

ঔরসজাত না হইলেও যে পুত্রপদবাচ্য হইতে পারা যায়, এই বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যেই তাহার রহস্য নিহিত রহিয়াছে। "পুন্নাম-নরকত্রাতা" বলিয়া পুত্রশব্দের যে ব্যুৎপত্তি সর্ব্বত্র সুপরিচিত, তাহা যে প্রকৃত ব্যুৎপত্তি নহে, তৎপ্রতি কটাক্ষ করিয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন—"যাহারা বেদোক্ত বিশেষ অর্থ অনবগত, সেই সকল তর্কলোলুপ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পুত্রাদি সাধনকে মোক্ষলাভের হেতু বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে।" *

বৈদিকযুগে এরূপ বিশ্বাস জনসমাজে প্রচলিত ছিল না। সে যুগের আর্য্যসমাজ কর্ত্তব্যপালনকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছিল। মনুষ্যমাত্রেই বিজয়যাত্রায় বহির্গত,—প্রত্যেকেই বীরব্রতে সঙ্কল্পারূঢ়। তাহাকে লোকত্রয় জয় করিতেই হইবে, তাহাতেই মানবজীবনের সফলতা। সেই বিজয়কার্য্য অসমাপ্ত থাকিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে পূরণকর্ত্তা নিযুক্ত করিতে হইত। সেই পূরণকর্ত্তার নাম "পুত্র"।

মৃত্যুকাল সমুপস্থিত হইলে, আমরা কেবল পুত্রের বিলাসভোগের ব্যবস্থা করিবার জন্যই "উইল্" করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ি। স্বর্গীয় পিতৃপুরুষেরাও "উইল্" করিতেন। তাঁহারা মৃত্যুকালে সস্নেহে পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া যথাশাস্ত্র মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া কহিতেন,—

ত্বং ব্রহ্ম ত্বং যজ্ঞস্ত্বং লোক ইতি।

'তুমি অসমাপ্ত বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিও; তুমি অসমাপ্ত যজ্ঞ সমাপ্ত করিও; তুমি অসমাপ্ত লোকজয় সমাপ্ত করিও। আমি যাহা পারিলাম, করিলাম; যাহা পারিলাম না, তাহা পূরণ করিবার ভার তোমার উপর ন্যস্ত করিলাম।'

এইরূপে মন্ত্রবাচনে পিতার ইচ্ছা পুত্রকে জ্ঞাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়া, বৈদিকযুগের আর্য্যসমাজ পিতাপুত্রের মধ্যে যে সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিয়াছিল, তাহা পিতৃধন উপভোগ করিবার,—পিতা এত অল্প রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়া ভর্ৎসনা করিবার,—আধুনিক সম্বন্ধ হইতে কত পৃথক্! তাহা কেবল পিতৃকর্ত্তব্যপালনের জীবনব্যাপী অধ্যবসায়ের সম্বন্ধ। তাহাতে পিতৃলোকের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল; পুত্রজীবন কৃতার্থ হইয়াছিল; দেশের মুখও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল!

যাহাকে এইরূপে মৃত্যুকালে "পুত্র" করিতে হইবে, তাহাকে আবাল্য সেইরূপ শিক্ষায় সমুন্নত করিবারই ব্যবস্থা ছিল। পিতা চিরজীবন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, তাহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিতেন। দশরথ এইরূপে রামচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন; তাঁহাকে "পুত্র" করিবেন বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঋষি যখন কোন তর্কেই কর্ণপাত করিলেন না, তখন বাধ্য হইয়া বলিতে হইল,—

বালং মে তনয়ং ব্রহ্মন্। নৈব দাস্যামি পুত্রকম্।"

'হে ব্রহ্মন্! রামচন্দ্র একে বালক,—তাহাতে আমার বংশবিস্তারকারক "তনয়",

* কেচিৎ বাবদূকাঃ শ্রুত্যুক্তবিশেষার্থানভিজ্ঞাঃ সন্তঃ পুত্রাদিসাধনানাং মোক্ষার্থত্বং বদন্তি।
—ইতি শাঙ্করভাষ্যম্।

—তাহাতে আবার মরণান্তে আমার ছিদ্র-পূরণকারী "পুত্র"রূপে নির্ব্বাচিত ও প্রতিপালিত হইতেছে;—তাহাকে কিছুতেই দান করিতে পারিব না!'

পুত্রশব্দের এই পুরাতন ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে, আর পুনরুক্তিদোষ দেখিতে পাওয়া যায় না; আর দোষক্ষালনের জন্ত আলঙ্কারিক কষ্টকল্পনারও প্রয়োজন উপস্থিত হয় না। বালং—তনয়ং—পুত্রকং—এই তিনটি শব্দের একত্র ব্যবহারে মহাকবি কত সংক্ষেপে, কত সুকৌশলে, দশরথের সকল কথা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুধাবন করিবামাত্র কবিগুরুর চরণতলে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে হয়! যাহা সত্যসত্যই কবিগুরুর রচনাগুণ, ব্যাখ্যা-বিভ্রাটে তাহাই রচনাদোষ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে! রামায়ণ যে সংহিতাযুগের গ্রন্থ, সেই যুগের প্রচলিত ব্যুৎপত্তি পরিত্যাগ করিয়া, উত্তরকালের ব্যুৎপত্তি লইয়া অর্থানুসন্ধান করিতে হইলে, এইরূপে পদে পদে বিড়ম্বিত হইতে হয়। রামায়ণে ইহার উদাহরণের অভাব নাই; বাহুল্যভয়ে একটিমাত্র উদাহরণ উল্লিখিত হইল।

রামায়ণের রচনাকালে আর্য্যসমাজে পুত্রশব্দের এই পুরাতন ব্যুৎপত্তিই প্রবল ছিল। "পুন্নাম-নরকত্রাতা" বলিয়া পুত্র-শব্দের যে ব্যুৎপত্তি এখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা রামায়ণের রচনাকালে জনশ্রুতিমধ্যে পরিগণিত ছিল;—লোক-সমাজে সুপরিচিত হয় নাই। রামায়ণে এই সিদ্ধান্তের অনুকূল প্রমাণের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পুরাণে চৌরাশী নরকের নাম ও বর্ণনা উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে পুৎ-নামক কোন নরকের নাম বা বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পুত্রশব্দের ব্যুৎপত্তিব্যাখ্যা ভিন্ন অন্য কোন উপলক্ষে সংস্কৃতসাহিত্যে পুৎ-নামক নরকের উল্লেখ হইয়া থাকিলেও, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পিতার অসমাপ্ত কর্ত্তব্য প্রতিপালিত না হইলে পিতার যে মনঃক্লেশ উপস্থিত হইতে পারে, তাহাকে পুৎ-নামক নরক বলিয়া কল্পনা করিয়া লইলে, পুরাতন ব্যুৎপত্তির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে পুৎ-নামক নরক কল্পিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই!

পুত্র যে পিতাকে নরক হইতে পরিত্রাণ করিয়া পারলৌকিক সদ্গতি দান করিতে পারে, বৈদিকযুগের আর্য্যসমাজে এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। আত্মাই আত্মার মিত্র,—আত্মাই আত্মার শত্রু;—আত্মা ভিন্ন অন্য কেহ তাহাকে মুক্ত করিতে পারে না;—এই চিরপ্রচলিত আর্য্যসংস্কার কালক্রমে পরিবর্ত্তিত না হইলে, লোকে "পুত্রাদি সাধনের মোক্ষার্থতা" প্রচার করিবে কেন? তাহা যে বেদার্থানভিজ্ঞ "বাবদূকগণের" ভ্রান্ত বিশ্বাস, কেবল তাহা বলিলেই যথেষ্ট হয় না। সত্য হউক, মিথ্যা হউক,—প্রকৃত হউক, আর ভ্রান্ত হউক,—এই বিশ্বাস এক সময়ে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহাকে অনার্য্য-বিশ্বাস বলিয়া নিন্দা করিতে পার, তথাপি এই বিশ্বাস যে আর্য্যসমাজে

প্রবিষ্ট হইয়াছে, সে ঐতিহাসিক সত্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই! কি সূত্রে এই বিশ্বাস আর্য্যসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া পুরাতন বিশ্বাসকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

পুন্নাম্নো নরকাৎ যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতৃন্ যঃ পাতি সর্ব্বতঃ ॥"

রামায়ণের এই শ্লোকে প্রসঙ্গক্রমে পুত্রশব্দের নূতন ও পুরাতন দুইটি ব্যুৎপত্তিই উল্লিখিত হইয়াছে। "ত্রায়তে" এবং "পাতি" ক্রিয়াপদ দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যুৎপত্তি সূচিত করিতেছে। রচনাভঙ্গী যেন স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে,—প্রথমটি আধুনিক ও অপ্রচলিত। "পুন্নাম-নরকত্রাতা" বলিয়া বক্তব্য শেষ করিলে, সকলে বুঝিবে না বলিয়াই যেন, সর্ব্বলোকপরিজ্ঞাত অন্য ব্যুৎপত্তিও উল্লিখিত হইয়াছে। পুত্রশব্দের এই ব্যুৎপত্তি মহাকবির স্বকপোলকল্পিত নহে। এই ব্যুৎপত্তি ভৃগুপ্রোক্ত "মনুসংহিতাতে"ও উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু সেখানে চতুর্থচরণ অন্যরূপ; এবং এই ব্যুৎপত্তির মূল কি, তাহাও অনুক্ত। রামায়ণে তাহা অনুক্ত নহে। কবিগুরু স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন,—গয়নামক অসুরের এই ব্যুৎপত্তি প্রচার করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

"শ্রূয়তে ধীমতা তাত! শ্রুতির্গীতা যশস্বিনা।
গয়েন যজমানেন গয়েষেব পিতৃন্ প্রতি ॥"

পিতৃলোকের উদ্দেশে গয়াসুরের যাহা গান করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যাইত, কালে তাহাই পুত্রশব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে। বাল্মীকি ইহাকে প্রচলিত বা আর্য্যসমাজসম্মত ব্যাখ্যা বলিয়া বর্ণনা করেন নাই; বরং বুঝিবার অসুবিধা দূর করিবার জন্য প্রচলিত ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। "মনুসংহিতায়" পুরাতন ব্যাখ্যাও উল্লিখিত আছে –

"পুত্রেণ লোকান্ জয়তি."

ইহা যে বৈদিকযুগের প্রচলিত ব্যুৎপত্তিকেই সূচিত করিতেছে, তাহাতে সংশয় নাই। বৈদিক ব্যুৎপত্তি অনুসারে, পিতার মৃত্যুর পর পুত্রের কার্য্যের আরম্ভ। জন্মমাত্রে পুত্র কোনই উপকার সাধন করিতে পারে না! গয়াসুরের ব্যুৎপত্তি অনুসারে, জন্মমাত্রেই পুত্র পিতাকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। "মনুসংহিতার" সুবিখ্যাত টীকাকার মেধাতিথি "পুত্রেণ লোকান্ জয়তি" এই বচনের ব্যাখ্যায় উভয় ব্যুৎপত্তির সামঞ্জস্যসাধনের আশায় লিখিয়া গিয়াছেন,—

"পুত্রেণ জাতেন, তৎকৃতেন উপকারেণ।" *

পুত্রের জন্মদ্বারা লোক জিত হয় না; পুত্রকৃত উপকারের দ্বারাই লোকজয় সুসম্পন্ন হয়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাহারই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণের টীকাকার আধুনিক ব্যক্তি হইয়াও, পুত্রশব্দের ব্যুৎপত্তিব্যাখ্যায় গয়াসুরের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন,—"পৃষোদরাদি" নিপাতনের নিয়মে পিতৃশব্দ হইতেই পুত্রশব্দ উৎপন্ন হইয়াছে! † উণাদিকারগণ আবার

* কুল্লূকভট্ট অনেকস্থলে মেধাতিথির ব্যাখ্যাকে চাতুরীমাত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও পুত্রশব্দের টীকা করেন নাই।

† "পিতৃন্ পাতি" ইত্যর্থে পুত্রস্ত "পৃষোদরাদিত্বাৎ" সাধুত্বম্। তিলকটীকা।

আর একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—যে পবিত্র করে, তাহারই নাম পুত্র. এই অর্থে পূ-ধাতু হইতে পুত্রশব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।'

"পূবো হুবন্ত।"

এই সকল বিভিন্ন ব্যুৎপত্তি বিভিন্ন যুগের আর্য্যসমাজের পুত্রবিষয়ক বিভিন্ন মত ও বিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তন্মধ্যে পুরণার্থক পৃ-ধাতু হইতে পুত্রশব্দের ব্যুৎপত্তিব্যাখ্যার পুরাতন মতই বেদবাক্য-সম্মত। রামায়ণের রচনাকালেও এই মত প্রচলিত ছিল;—কিন্তু একালের সুবৃহৎ অভিধানেও তাহার উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না! "শব্দকল্পদ্রুমে" বা "বিশ্বকোষে" পুত্রশব্দের ব্যাখ্যার আড়ম্বরের অভাব নাই; কিন্তু যে ব্যাখ্যাটি বেদবাক্যসম্মত, শঙ্করাচার্য্যধৃত, পুরাতন সাহিত্যে ব্যবহৃত, এবং অনাত্মজ ব্যক্তির পুত্রনামগ্রহণের রহস্যোদ্ধারে সুসমর্থ,—তাহার কথা উল্লিখিত হয় নাই।

পুন্নামনরকের ব্যুৎপত্তিকে পুত্রশব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি বলিয়া স্বীকার করিলে, পুত্রশব্দের বর্ণবিন্যাসে তকারদ্বয়ের প্রয়োজন হয়। পুরাতন ব্যুৎপত্তি অনুসারে তকারদ্বয়ের প্রয়োজন অলঙ্ঘনীয় নহে। পুরাকালে পুত্রশব্দের কিরূপ বর্ণবিন্যাস প্রচলিত ছিল, তাহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেও দেখিতে পাওয়া যায়,—পাণিনিযুগে তকারদ্বয়ের প্রয়োজন অলঙ্ঘনীয় বলিয়া পরিচিত ছিল না। ইহার বিচার জটিল হইবে বলিয়া, এস্থলে উল্লিখিত হইল না। বিশেষজ্ঞগণ এখনও পুত্রশব্দের বর্ণবিন্যাসে তকারদ্বয়ের ব্যবহার করেন না কেন, তাহার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলেও, পুত্রশব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি পুনরায় লোকসমাজে সুপরিচিত হইতে পারে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

আর্ট কাহাকে বলে ?

রুশদেশীয় সাহিত্যিক টল্‌স্টয়ের what is art ? আর্ট কি, একটা প্রসিদ্ধ পুস্তক। টল্‌স্টয় বলিতেছেন, আর্টের খাতিরে ইউ-রোপের সহস্র সহস্র লোক খাটিয়া মরিতেছে, তাহাদের কোন আনন্দ নাই, তৃপ্তি নাই, ছাপাখানায়, থিয়েটারে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি নষ্ট করিতেছে। এ আর্ট ব্যাপারটা কি, এবং মানুষের পক্ষে ইহা এমনি কি প্রয়োজনীয়, দেখা যাক্।

আর্টের বিরুদ্ধে দাঁড়ান বড় সহজ নয়। বস্তুত আর্টকে বাদ দিলে ইউরোপীয় ধনী ও বিলাসী সম্প্রদায়ের কিছুই থাকে না। তাহা-দের আমোদ জোগাইবার জন্য অসংখ্য

লোকের এই দুরূহ পরিশ্রম এবং তাহারাও সাধ্যমত এই অগ্নিতে অর্থের ইন্ধন দিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না।

এই আর্টটা কি, ইউরোপীয় নানা পণ্ডিত নানা উপায়ে বলিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। একটা বড় কথা হচ্চে সৌন্দর্য্য, যাহা সকলেরই মুখে মুখে ফিরে। সৌন্দর্য্য যাহাতে আছে, তাহাই আর্ট। সৌন্দর্য্য মানে কেবল চক্ষুকে যাহা তৃপ্ত করে, তাহাই নয়,—তাহার অনেক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইয়া গেছে। কেহ বলেন, সত্যের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের সম্পর্ক;—যাহা ভাল নয়, তাহা সুন্দর নয়; কেহ বলেন, সৌন্দর্য্যটা বস্তুত বাহিরের নয়, বাহিরে তাহার প্রকাশ মাত্র,—সৌন্দর্য্য হচ্চে আত্মার; কেহ বলেন, ভালমন্দ কিছু নয়,—সৌন্দর্য্য হচ্চে যাহা চিত্তকে আনন্দ দেয়, সে আনন্দের সঙ্গে প্রয়োজনের কোন সম্বন্ধ নাই। এইপ্রকার নানা মুনির নানা মত আছে, তাহা জানিয়া বিশেষ কোন লাভ নাই। কিন্তু একটা কথা বেশ সুস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে যে, ইউরোপীয় আর্ট-সমালোচক আর্ট বলিতে বুঝেন—সৌন্দর্য্যকে যাহা প্রতিভাত করে এবং সৌন্দর্য্যের অর্থ তাঁহাদের অভিধানে যাহা খুসি করে, আনন্দ দেয় বই আর কিছুই লেখে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আর্টের গোড়ায় এক মানে লিখিয়া, শাস্ত্র তৈরি করিয়া পরে যেমন খুসি তেমন জিনিষকে আর্টের দোহাই দিয়া তাঁহারা চালাইতেছেন।

মানুষের খাদ্যসম্বন্ধে কেহ যদি বলে যে, খাদ্য রসনাকে তৃপ্ত করে বলিয়াই মানুষ খায়, তবে সে যেমন হয়, তেমনি আর্টসম্বন্ধেও শুধু আনন্দ দেয় বলিয়া আর্ট সৃষ্ট হইতেছে বলিলে আর্টের মানে এবং প্রয়োজনীয়তাই বুঝা যাইবে না। এই যে একটা প্রকাণ্ড চেষ্টা মানুষের, ইহা কেন মানুষের অন্তরে এমন প্রবল এবং ইহার ফলাফলই বা কি জানিতে হইবে—খুসি বলিলে কোন কথাই বলা হয় না।

মানুষে মানুষে মিলিবার একটা পথ হচ্চে আর্ট। কথার দ্বারা যেমন আমরা আমাদের ভাবনা ও অভিজ্ঞতা জানাই এবং অন্য মানুষের মনের সঙ্গে সেই প্রকাশের সূত্রে আমাদের যোগ হয়, আর্টের দ্বারা তেমনি আমরা আমাদের অনুভূতিকে অন্যের অন্তরে উদ্বোধিত করি। এই একজনের অনুভূতি অন্যের মধ্যে সংক্রামিত হইবার উপায় আর্ট ছাড়া দ্বিতীয় কোন জিনিষের দ্বারা হইতে পারে না।

বরাবর মানুষ নিজের অন্তরের অনুভূতিকে নানারূপ প্রকাশের দ্বারা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছে। ছবি, গান, মূর্ত্তি, কবিতা, কত উপায় যে তাহাকে অবলম্বন করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

কিন্তু সকলপ্রকার প্রকাশচেষ্টাকেই কি আমরা আর্ট নাম দিই? কাপড়চোপড় ঘটিবাটি ও এক হিসাবে আর্ট বটে, কিন্তু তাহার কথা হইতেছে না। মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বড় বস্তু অনুভূতির প্রকাশকেই আর্ট নাম দিয়া থাকি,—সেই আর্টের সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাইতেছে।

মানুষের হৃদয়ের মধ্যে মানুষের হৃদয়ের প্রবেশের দ্বারই যদি আর্ট হয়, তবে ইহা যে কত বড়, একটুখানি চিন্তা করিলেই বুঝা

যাইবে। বস্তুত আর্টকে বদ্ধ করিবার কোন উপায় নাই মানুষ ক্রমাগত নিজের অনুভূতিকে নানাপ্রকারে প্রকাশ করিবে, মানুষের নিকট চিরদিন সে প্রকাশ আছে এবং থাকিবেও। • •

এই পর্য্যন্ত টল্‌স্টয় যে সংজ্ঞা আর্টের দিলেন, তাহা বোঝা গেল। কিন্তু এইটুকু বলা শেষ করিয়াই তিনি আর্টের এক গণ্ডী টানিতেছেন—সে হচ্চে ভালমন্দের গণ্ডী, ধর্ম্মের গণ্ডী; বলিতেছেন যে, আর্টকে সেই মাপকাঠিতে তৈরি করিতে হইবে ও বিচার করিতে হইবে।

তিনি বলিতেছেন যে, মানুষ জীবনের অর্থ ক্রমেই বুঝিতেছে। মানুষের উন্নতির মানেই তাই যে, ক্রমে জীবনের অর্থ মানুষের কাছে স্ফুটতর, সম্পূর্ণতর হইয়া উঠিতেছে। মানুষের মধ্যে সর্ব্বদাই এমন-সকল লোক জন্মগ্রহণ করেন দেখা যায়, যাঁহাদের নিকট মানবজীবনের অর্থটা অন্যান্য মানুষের চেয়ে আরও খোলসা হইয়া দেখা দিয়াছে। এই জীবনের অর্থ লইয়াই জগতে নানা ধর্ম্মের উৎপত্তি—কালে কালে এই অর্থকে মানবগুরুগণ গভীরতর, ব্যাপকতর করিয়া বুঝিয়াছেন। সমস্ত মানুষও ইহাকে গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং এই ধর্ম্ম দিয়াই বিচার করা যাইতে পারে—কোন্ ভাবটা ভাল, কোন্ ভাবটা মন্দ। যে সকল অনুভূতি এই ধর্ম্মভাবের সঙ্গে খাপ্ খায়, মানুষ তাহাকে আপনার করিয়া লয় এবং ভাল বলিয়া বিবেচনা করে; যে সকল অনুভূতি খাপ্ খায় না, মানুষ তাহাকেই মন্দ বলে এবং পরিহার করে।

ইহুদীগণ এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করিত, ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া যাহা মানিত, তাহাকেই সযত্নে রক্ষা করা ছিল তাহাদের ধর্ম্ম। সুতরাং এই ধর্ম্মভাবের অনুভূতির দরুণ তাহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইল যে আর্ট, তাহা তাহাদের পক্ষে অপর সকল আর্ট অপেক্ষা বড় হইল। Psalms, Book of genesis প্রভৃতি হইল একমাত্র শ্রেষ্ঠগ্রন্থ। গ্রীকেরা জীবনের অর্থ অন্যরূপ বুঝিয়াছিল। পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যকেই তাহারা বড় করিয়াছিল, সুতরাং সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্য, বল, জীবনের স্ফূর্ত্তি ও সম্ভোগ তাহাদের আর্টে স্থান পাইল—কুৎসিত রূপ, হীনবীর্য্যের ভাব কাছেও ঘেঁষিতে পাইল না। এইরূপে যে-কোন জাতিকে দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, তাহাদের জীবনের আদর্শের অনুকূল যে আর্ট, তাহাকেই তাহারা গ্রহণ করিয়াছে, প্রতিকূল কোন আর্টকেই স্বীকার করে নাই, পরিহার করিয়াছে।

প্রতি যুগে, প্রতি সমাজেই এইপ্রকারের একটা ভালমন্দর ধারণা, একটা ধর্ম্মভাব আছে, এবং এই ভাবটি থাকার জন্য আর্টের ভালমন্দও বিচার করা চলে।

খৃষ্টধর্ম্ম প্রথমে শুধু খৃষ্টকে লইয়াই ব্যতিব্যস্ত ছিল, তজ্জন্য খৃষ্টের নামগন্ধ যাহাতে নাই, এমন সমস্ত আর্টকে সে অবজ্ঞাই করিয়াছিল। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম যে মুহূর্ত্তে গির্জ্জার ধর্ম্ম (church-religion) হইল, তখনই যীশু-মাতা, দেবদূত, পরী, সাধু, পীর প্রভৃতি কত-কি যে তাহার মধ্যে ছড় করিয়া স্থান পাইল এবং কত মূর্ত্তিই যে পূজা পাইতে লাগিল, তাহার সীমা নাই।

খৃষ্টের শিক্ষার সহিত ইহার মিল থাক্ বা নাই থাক্, এই আর্ট তখনকার সমাজের উপযোগী ছিল—সমস্ত মানুষের অনুভূতিরই ইহা প্রকাশমাত্র ছিল—কারণ সকলেই এই সমস্ত মূর্ত্তি ক্রিয়াকলাপে বিশ্বাস করিত, ইহা তখনও বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের হইয়া পড়ে নাই।

কিন্তু অনুষ্ঠানের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে পোপে ও প্রচলিত ধর্ম্মে ধনী ও উচ্চ সম্প্রদায়ের ক্রমে অনাস্থা জন্মিল, খৃষ্টের শিক্ষার সঙ্গে চর্চ্চের শিক্ষার বিরোধ স্পষ্টই সকলের চোখে ফুটিল।

যদিও লুথর (Luther), ক্যাল্ভিন্ (Calvin), উইক্লিফ্ (Wycliffe) প্রভৃতি কোন কোন মনীষী খৃষ্টের যথার্থ উপদেশ গ্রহণ করিয়া চর্চ্চের সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন, কিন্তু সমস্ত ধনিসম্প্রদায় তাহা করিলেন না, করাও কোনমতেই সম্ভবপর ছিল না। সকলেই কিছু সত্যকে যথাযথ দেখিতে পায় না এবং দেখিতে পাইলেও গ্রহণ করা আরও শক্ত হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং তাঁহারা কোন ধর্ম্মেই রহিলেন না।

তার পর ইউরোপীয় রেনেসাঁস্ (Renaissance) যে জাগিল, যখন নাকি আর্ট ও বিজ্ঞান তাহার চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল,—তাহার মূলমন্ত্র হইল ধর্ম্ম বলিয়া কোন জিনিষ নাই, তাহাকে অস্বীকার করাও অনায়াসেই চলে। জীবনের অর্থ দাঁড়াইল আমোদপ্রমোদ, সুখসম্ভোগ করা। সুতরাং সৌন্দর্য্যচর্চ্চা অর্থাৎ যথেচ্ছাচার ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিল। গ্রীক্‌দের টানিয়া-আনিয়া সৌন্দর্য্যচর্চ্চার পাণ্ডাগণ বলিলেন যে, ইহাও তাঁহাদের নবাবিষ্কার নয়, বহুপূর্ব্ব হইতেই ইহা আছে,—গ্রীক্‌দের মধ্যেও ইহা ছিল। গ্রীক্‌দের মধ্যে নৈতিক আদর্শটা আসলেই উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই, তাহারা সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সতের একটা আব্‌ছায়া-সম্পর্ক পাতাইয়াছিল, সেই আগাগোড়া গোলমেলে ব্যাপারের উপর দাঁড়াইল বর্ত্তমান যুগের Æsthetics—সৌন্দর্য্যতত্ত্ব।

আর্ট যে মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তাহা বুঝি—লোকে যখন ভারতবর্ষীয়, চীনদেশীয়, গ্রীক্, ইহুদী, কি মিশরের আর্ট বলে, তখন বুঝি যে, সে দেশের সব চেয়ে বড় অনুভূতি যেগুলি, সেইগুলিকে আশ্রয় করিয়া এই সমস্ত আর্ট জাগিয়াছে,—কিন্তু মানুষের সঙ্গে কোন সংশ্রব নাই, সমস্ত মানুষ যাহার জন্ত খাটিয়া মরিবে, অথচ তাহার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইবে, একটি সম্প্রদায়বিশেষেই যাহা আবদ্ধ, ইহা কোন্ আর্ট? কিন্তু ইহাকেই একমাত্র খাটি আর্ট বলা হইতেছে।

যে সমস্ত ক্রীতদাস দিন হইতে দিন, রাত্রিরও অধিকাংশ সময় বিনিদ্র হইয়া—এই আর্টের আমোদ জোগাইবার জন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে, ইহার রসাস্বাদনে যাহারা বঞ্চিত, তাহাদের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দাও, দেখি তোমাদের চাক্‌চিক্যময় আর্ট দাঁড়ায় কোথায়!

এইখানে কথা উঠিবে যে, আর্ট বুঝিতে গেলে যতটা শিক্ষা দরকার করে, তাহা ইহাদের নাই, সে শিক্ষা হইলে ইহারা আপনিই বুঝিতে পারিবে। সকল আর্টেই দেখা গিয়াছে, প্রথমে লোকে বুঝিয়া উঠে নাই, পরে বুঝিয়াছে।

কিন্তু কথা হচ্ছে যে, এই বর্ত্তমান আর্টের প্রকৃতি এতই বিভিন্ন,—সমস্ত মনুষ্যপ্রকৃতি হইতে এতই সুদূরে যে, ইহাকে বুঝিয়া উঠাই প্রথমত দুঃসাধ্য। যে সকল অনুভূতিকে এই আর্ট ক্রমাগত প্রকাশ দিবার চেষ্টা পাইতেছে,—যেমন স্বাদেশিকতা, স্ত্রীপুরুষের প্রেম ইত্যাদি—সে সমস্ত অনুভূতি এম্‌নিই অদ্ভুত যে, তাহা কখনই সমস্ত মানুষের হইতে পারে না। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে আসিতেই হয় যে, এ আর্ট জীবন্ত ও সবল অনুভূতি হইতে উদ্ভূত নয়, এ আর্ট বিকৃত আর্ট।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত বড় বড় অনুভূতি ধর্ম্মভাব অন্তরে সজীব থাকিলেই যেগুলি সম্ভবপর হয়, যাহা এক কালে সমস্ত মানুষকে আনন্দ দিত, বল দিত, স্বাস্থ্য দিত,—তাহা আজকাল ধর্ম্মভাবে অবিশ্বাসের জন্য উচ্চসম্প্রদায় একেবারে হারাইয়াছে। হারাণর দরুণ আর্ট বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে; তাহাতে সুস্থতার লক্ষণমাত্র নাই। এই বিকারের কতগুলি লক্ষণ দেখা দিয়াছে, যথা—আর্টের বিষয়ের লঘুত্ব, জটিলতা, অস্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতা প্রভৃতি।

আর্টের বিষয় যে হাল্‌কা হইয়া পড়িতেছে, তাহার কারণ হচ্ছে সরস অনুভূতির অভাব। যদি আমোদই একমাত্র চিন্তার বিষয় হয়, তবে তাহার রসদ জোগান শক্ত ব্যাপার। একই জিনিষকে ঘাঁটাইলে তাহা ক্রমেই দুর্ব্বল ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িবে। কিন্তু সরস অনুভূতি ধর্ম্মভাব হইতে আইসে। ধর্ম্মভাব যাহার মধ্যে যত পরিস্ফুট, যত ব্যাপক, যত গভীর হইতেছে, জীবনের মধ্যে ততই সে প্রবেশ করিতেছে,' তাহার প্রসার বাড়িয়া যাইতেছে, অননুভূত অনুভূতি তাহার অন্তরে জাগিতেছে। এ অনুভূতির বস্তুত শেষ নাই, কারণ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত মানুষের যে সম্বন্ধ, এ ক্ষেত্রে মানুষ তাহা যে প্রতি মুহূর্ত্তেই নবীন করিয়া উপলব্ধি করিতেছে। বর্ত্তমান আর্টের দলের লোকেরা বলেন যে, ইঁহাদের বিষয়ের অন্ত নাই, বাহির হইতে মনেও তাহাই হয় বটে, কিন্তু আমোদ ত আর অসীম হইতে পারে না। তিনটিমাত্র অনুভূতির বিষয় ইঁহাদের আছে দেখিতে পাওয়া যায়, এক—আভিজাত্যের গর্ব্ব, দ্বিতীয়—কামপ্রবৃত্তি, তৃতীয়—একটা শূন্যতা ও অবসাদের ভাব। এই কামপ্রবৃত্তির ইন্ধন ইঁহাদের আর্ট নিত্য নূতন জোগাইতেছে—নভেলে, নাটকে, স্ত্রীলোকের নগ্নমূর্ত্তির চিত্রে ও নানাপ্রকার শ্লীলতাবর্জ্জিত ছবিতে ও গানে।

জটিলতার কারণও এই সাম্প্রদায়িকতার জন্য। যত বড়ই উঁচু কথা বলা যাক্ না কেন, তাহার প্রকাশ স্বভাবতই এম্‌নি হওয়া উচিত, যাহাতে বুঝিবার পক্ষে কোন বাধা না থাকে। একটা সোজাসুজি খোলাখুলি প্রকাশ সমস্ত বড় আর্টেই দেখা যায়। কিন্তু এই সমস্ত আর্টিষ্ট ধোঁয়াল-মেঘল করিয়াই বলিতে ভালবাসেন, তাহার মধ্যে এমন সমস্ত কথার উল্লেখও মাঝে মাঝে করিয়া থাকেন,—যাহা তাঁহাদের দলের লোক ছাড়া আর কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। দেখা যায় যে, সাদা কথাকে ঘুরাইয়া বলাই ইঁহাদের মতে আর্ট। আজকাল যে-কোন লেখকের কবিতা কিংবা গল্পরচনা

লইয়া বস না কেন, সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না। ভারলেন, বদেলেয়ার আজকাল ফরাসীস্‌দের মধ্যে সব চেয়ে বড় কবি, অথচ ইঁহাদের বলিবার কথা যে কি, তাহা বুঝা যায় না। একজন বলেন, নীতি কিছু না, সৌন্দর্য্যই সব। অপরটিও তাই। তিনি আবার ক্যাথলিক্ মূর্ত্তি-উপাসক। ফ্রান্সের নমুনা ত এই। ইংলণ্ড, জর্ম্মাণী, সুইডেন, নরওয়ে, ইতালী, রুশিয়া, সমস্ত দেশেই এই দুর্দ্দশা—এবং এক কবিতায় নয়, ছবিতে, গানে, নাটকে, আর্টের সকল ক্ষেত্রেই।

তৃতীয় ব্যাপার হচ্চে অনুকরণ, পুনরাবৃত্তি, সর্ব্বপ্রকার অস্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতা। অনুভূতি না আসিলেও জোর করিয়া যদি তাহাকে টানিয়া আনিতে হয়, তবে আর্টে কৃত্রিমতা জন্মে। অনুভূতি নাই—পরের ধার-করা অনুভূতিকে লইয়া ঘষিয়া-মাজিয়া রঙ্‌চঙ্ দিয়া চক্ষু ঝল্‌সাইবার চেষ্টা হচ্চে আজকালকার আর্টের আর একটা লক্ষণ। কতকগুলি কবিত্ব আছে (আমাদের দেশে যেমন মলয়পবন, বসন্ত, কোকিলের কুহু-কুহু), সেইগুলি লইয়া এবং একটা বর্ণনার মাত্রা অতিরিক্ত চড়াইয়া, খুনজখম একটা-কিছু দাঁড় করাইয়া আর্টিষ্টরা লোকের মনে বিভ্রম জন্মাইবার চেষ্টা করেন। এ কথা ভুলিয়া যান যে, অনুভূতি যদি বাস্তবিক অন্তর হইতে না জাগে, তবে বাহিরের সাজসজ্জায় রূপ ফুটিয়া উঠিবে না, বরং রূপের অভাবই প্রকাশ পাইবে। হ্যানিলে নাটকটি যেমন। একটি নিরপরাধা বালিকা তাহারা মাতাল পিতার নিকটে নৃশংস ব্যবহার পাইতেছে, সেই উপলক্ষ্য করিয়া নাটককার দর্শকের করুণা উদ্রেক করিতে চান। ভাল, এমন করিয়া তাহার মুখ দিয়া কিংবা অন্য কাহারও মুখ দিয়া তিনি দুঃখপ্রকাশ করান, যাহাতে সকলের হৃদয় করুণায় দ্রব হয়। তাহা নয়, ষ্টেজের আলো নিভাইয়া—মাতাল পিতা মেয়েটিকে মারিতেছে, তাহার চাপা কান্নার স্বর শ্রোতাদের কানে পৌঁছাইয়া দেবদূত পরী তাহাকে লইতে আসিতেছে—কত-কি কাণ্ড করিয়া মন্ত্রমুগ্ধ করিবার চেষ্টা! এই যে Sensationalism—ইন্দ্রিয়ের উপর একটা অনাবশ্যক তাড়নাদ্বারা চিত্তবিভ্রম জন্মান, ইহা উচ্চ আর্টের অঙ্গীভূত একেবারেই নয়, ইহা অন্যায়। তাই তাক্-লাগান হিসাবে কোন আর্ট যত বড়ই হোক না কেন, যদি সুস্থ, মহৎ, বৃহৎ অনুভূতি অন্যের মধ্যে সংক্রামিত করিতে সে আর্ট সক্ষম না হয়, তবে সে আর্টকে কিছুতেই বড় আর্ট বলা চলে না।

এই অনুভূতির একটা বিশেষত্ব হচ্চে, যে আর্টের ভাবটি যে ব্যক্তি গ্রহণ করুক, তাহার সহিত আর্টিষ্টের এমনি মনের মিল হইয়া যাইবেই যে, গ্রহীতার মনে হইবে, বুঝি আর্টটি তাহারি নিজের রচনা, আর কাহারও নয়। এই যে নিজের ব্যক্তিত্বকে একেবারে প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলা, বিশ্বমানবের সঙ্গে নিজের একাত্মভাব অনুভব করা, ইহাতেই আর্টের শক্তি, এবং এই শক্তির জন্যই মানবসমাজে আর্ট অত বড় স্থান পাইয়াছে। সুতরাং (আমি টল্‌স্টয়ের শেষ কথায় আসিয়াছি) জ্ঞানের অভিব্যক্তিতে যেমন দেখা যায় যে, ভুলচুক এবং অনাবশ্যক জিনিষ বাদ পড়িয়া

ক্রমেই যেটুকুই আসল এবং যথার্থ জিনিষটুকুই দাঁড়াইয়া যায়, অনুভূতির ক্ষেত্রেও অনুভূতির বিষয় হইতে ঝড়্‌তি-পড়্‌তি কাটিয়া-গিয়া পরে জিনিষগুলিই ক্রমে টিকিয়া যায়। তজ্জন্য পূর্ব্বে বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে যে সীমাবদ্ধ ধর্ম্মভাবটুকু ছিল, যাহা তাহাদের আর্টের ভালমন্দ-বিচারে সহায়তা করিত, ভবিষ্যতে সেই জাতিগত, সম্প্রদায়গত বা দেশগত সীমাটুকু টানিয়া রাখিলে চলিবে না, আর্টকে সমস্ত মানুষের করিতে হইবে। আজকাল জীবনের অর্থ হইবে—মানুষে মানুষে প্রীতির সম্বন্ধ, মঙ্গলসম্বন্ধ স্বীকার-করা, মানুষের সুখদুঃখ নিজের বলিয়া ভাবা, মানুষ বলিয়া নিজেকে জানা।

অতএব এই অনুভূতিকে যে আর্ট সব চেয়ে বেশী প্রকাশ দিতে পারিবে, সেই আর্টই হইবে আধুনিক আর্ট; যাহা পারিবে না, তাহাকে বর্জ্জন করিবার দিন আসিয়াছে।

কোন্ অনুভূতিতে মানুষ এক বলিয়া নিজেকে মনে করে, দেখিতে গেলেই চোখে পড়ে—দুটো জিনিষ। এক হচ্চে—আমাদের এক ঈশ্বর, আমরা সকলেই তাঁহার সন্তান, এই ধারণা। দ্বিতীয় হচ্চে—সাধারণ জীবনের সুখদুঃখ, বিশেষ কোন সাম্প্রদায়িক জীবনের সুখদুঃখ নহে। এই আর্টের দৃষ্টান্তস্বরূপে একপক্ষে Schillerএর Robbers, Victor Hugoর Les Miserables, George Eliotএর Adam Bede প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে, অন্যপক্ষে Moliere, Dickens প্রভৃতির লেখার নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।

স্ত্রীপুরুষের প্রেমকে টল্‌স্টয় একপ্রকার আর্টের ক্ষেত্র হইতে বিদায় দিয়া পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছেন। সে প্রেমে মানুষকে নাকি কলুষেই টানিয়া লয়, অতএব গোড়া ঘেঁষিয়া তাহাকে উন্মূলিত করিয়া ফেলা হউক্, নবীন আর্টের সহিত তাহার কোন সংস্রব না থাকুক।

টল্‌স্টয়ের আর্টসম্বন্ধে বক্তব্যবিষয় আমি সংক্ষেপে উপস্থিত করিলাম। পঞ্চদশ বর্ষের অধ্যবসায়ের ফলে নাকি পুস্তকখানি বাহির হইয়াছে। অল্প কথায় তাহাকে সারিয়া দিয়াছি, জানি না, ভুলচুকের হাত অতিক্রম করিয়াছি কি না। বারান্তরে টল্‌স্টয়ের আর্টের মন্তব্যসম্বন্ধে কি বলা যাইতে পারে, দেখা যাইবে।

শ্রী—

ত্রিবঙ্কুর ও কোচিন।

দাঁড়ীরা সমস্ত রাত্রি অবিরাম তালে-তালে দাঁড় ফেলিয়াছে। এই কবোষ্ণ রাত্রির অবসানে, নব শতাব্দীর নবরক্তিম প্রথম সূর্য্য, একপ্রকার মৎস্যজীবি জগতের উপর সমুদিত হইল;—যে জগতের লোক শিকারে রত,—যাহারা এই অকলুষ তরুণ আলোকে আহার্য্য-আহরণের প্রত্যাশায় চারিধারে বসিয়া আছে। বিশাল-বিস্তীর্ণ বিল; দুই ধারের তালজাতীয় নিবিড় তরুপুঞ্জ তটের উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে; অসংখ্য জেলে-নৌকা;—অনেক সময়ে আমাদের নৌকার গা ঘেঁষিয়া যাইতেছে—আমাদের পথরোধ করিতেছে। কোন নৌকা একস্থানে স্থির হইয়া আছে, আবার কোন নৌকা, যতদূর সম্ভব—নিঃশব্দে মণ্ডলাকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। লোক-গুলা,—জাল, ছিপ্, বল্লম হস্তে লইয়া, তাসস্থ তক্তার উপর, সজাগ সতর্কভাবে দাঁড়াইয়া আছে; জলের মধ্যে কোথাও কিছু নড়িলেই ব্যগ্রভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে। পানিভেলা, বক এবং অন্যান্য ছোট ছোট পাখীরাও জলের ধারে কাদার উপর বসিয়া অন্বেষণের তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে; এবং অনেক বর্ষির কাঁটায়, প্রসারিত মৎস্যজালে, ত্রিমুখ শূল-অস্ত্রে, শত শত মৎস্যের মুখ আট্‌কাইয়া রহিয়াছে। এই বিলটি—এই সব শীতলমাংস নিঃশব্দচারী ক্ষুদ্রজীবের অক্ষুরন্ত জলাধার। তাই, এত অসংখ্য মৎস্যভোজী এইখানে আকৃষ্ট হয় এবং মৎস্য আহার করিয়া প্রাণধারণ করে। নবোদিত শতাব্দী এ সমস্ত কিছুই পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না,—এই ব্যাপার অনাদি-কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

তটভূমি নিকটবর্ত্তী হইলে দেখা যায়,—মহাপ্রভাবশালী নারিকেলপুঞ্জের নীচে, নিম্নশ্রেণী ইতর লোকদিগের বাস। এই দীনহীন মানবকুলের অস্তিত্ব বৃক্ষগণের অস্তিত্বের উপর একান্ত নির্ভর করে। নারিকেলপত্রের ডাঁটাগুলা একটা গুঁড়ি হইতে অন্য গুঁড়িতে প্রসারিত হইয়া বেড়ার কাজ করিতেছে; মৎস্যের জাল, রসারসি—সমস্তই নারিকেল-ছোব্‌ড়ায় প্রস্তুত।

এই অতীব প্রয়োজনীয় বৃক্ষগুলি শুধু যে ছায়াদান করে,—ফলদান করে,—তৈল-দান করে,—তাহা নহে; যাহারা উহাদের হরিৎশ্যামল অনন্ত ছায়াতলে বাস করে, তাহাদের যাহা কিছু আবশ্যক, সমস্তই উহারা জোগাইয়া থাকে।

রঙিন-রেশমের তল্‌তলে গদির মত, চৌকোণা এক-এক টুক্‌রা ধানের ক্ষেত যে ইতস্তত দেখা যায়—মনে হয়,—এ প্রদেশে সে সকল ক্ষেত না থাকিলেও চলে—খাদ্যের কোন অভাব হয় না।

বিলটি ক্রমশই বিস্তৃত আকার ধারণ করিতেছে। এইবার একটু অনুকূল বাতাস উঠিয়াছে। বাহুবয়ের সাহায্যার্থ,—মাল্লারা, ৪।৫গজ উচ্চ একটা লম্বা একটা মাস্তলের উপর চড়াইয়া দিল; নিরীহ ধরণের এই ক্ষুদ্র সমুদ্রটির উপর পাল ও দাঁড়যোগে আমাদের নৌকা আরো দ্রুত চলিতে লাগিল। বিলের দুই কূলে, বন; এই বনরাজি দূর হইতে নীলাভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বায়ুযোগে, নৌকার প্রসারিত পালটি ফুলিয়া উঠিয়াছে; এই বায়ুর সাহায্য পাইয়া মাল্লারা নিজ বাহুবেগ অনেকটা কমাইয়া দিয়াছে এবং আর-এক ধরণের তান উঠাইয়া একপ্রকার ঘুমের গান মুখ বুজিয়া গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে। মনে হয়, যেন গির্জ্জা-ঘড়ির সুর-সংবলিত ঘণ্টাধ্বনি দূর হইতে আসিতেছে—আর যেন, তাহা ফুরায় না।

ফ্রান্সে, এ সময়ে প্রায় মধ্যরাত্রি; এই সময়ে বিংশতি শতাব্দী প্রথম পদার্পণ করিয়াছে। এই নববর্ষের উৎসব আজ সেখানে অন্ধকারের মধ্যে, বরফের মধ্যে, পূর্ণ উপচারে অনুষ্ঠিত হইবে।

বাতাস পড়িয়া গেল। মধ্যাহ্নের শুভ্রোজ্জ্বল নিস্তব্ধতা—অগ্নিকুণ্ডবৎ উষ্ণতা। নারিকেলতরুশোভিত তটভূমিতে আমাদের নৌকা আসিয়া ভিড়িল। প্রাতঃকালের মাঝিমাল্লারা এইখানে বদ্‌লি হইল,—অতীব নতভাবে উহারা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। নূতন মাল্লারা আর-একটু উজ্জ্বল-তাম্রবর্ণ; উহাদের বহুল কণ্ঠমালা,—কানবালা; গাত্রে নানাবিধ পৌরোহিত্যিক নক্সা ধূসরবর্ণে অঙ্কিত। এক্ষণে উহারা ভীষণবেগে দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিল। বায়ু ভারাক্রান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। উষ্ণবাষ্পগর্ভ পরিম্লান আকাশমণ্ডল, বিস্তীর্ণ আবিল জলাশয়, সমস্ত জীব, সমস্ত পদার্থ,—অতিরিক্ত আলোকপ্রভাবে যেন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। নেত্রাভিঘাতী অত্যুজ্জ্বল একটা শাদা-রঙের ব্যাপক প্রলেপে যেন সমস্তই একাকার। আবার এই সমস্ত একাকারের মধ্যে, নৌকার চতুষ্পার্শ্বে, উজ্জ্বলকান্তি কাটা-ছোলা হীরার টুক্‌রাগুলির মত—জলবিন্দু উচ্ছ্বসিত হইতেছে,—দাঁড়ের গা দিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে; এবং দাঁড়ীদেরও ললাট ও বক্ষ বাহিয়া স্বেদবিন্দু স্যন্দিত হইতেছে।

প্রায় তিনঘটিকার সময়, ত্রিবঙ্কুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, ক্ষুদ্র কোচিনরাজ্যে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু, কি জলরাশির উপর, কি তালীবনের মধ্যে—কোথাও কিছু রূপান্তর লক্ষিত হইল না। কেবল, দিবাবসানে, বৃহৎ নদীর ন্যায় পরস্পর-দূরবর্ত্তী দুই কূলে, নগরাদি দেখা যাইতে লাগিল।

অপেক্ষাকৃত নিকটতর দক্ষিণকূলে রাজার রাজধানী—"এরাকুলম"-নগর। এইখানে রাজা বাস করেন। বিলের বরাবর ধারে-ধারে, প্যাগোদা-মন্দিরের ন্যায় চারিটা শীরীয় খৃষ্টসম্প্রদায়ের গির্জ্জা, একটা বৃহৎ দেবমন্দির, কতিপয় সৈন্য-নিবাস, কতকগুলি পাঠশালা;—এই সমস্ত, লালমাটীর উপর অধিষ্ঠিত ও রক্তিমবর্ণ। একটি মনুষ্য নাই। কিনারায়

একখানি নৌকা নাই। এই সমস্ত প্রাণহীন নিষ্প্রভ ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বরের পশ্চাতে বিষয়বিতৃষ্ণ ব্রাহ্মণদিগের আবাসগৃহগুলি অরণ্যের নিবার-অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া,—সর্ব্বগ্রাসী তালজাতীয় তরুপুঞ্জের মধ্যে, ঝোপ্‌ঝাড়ের মধ্যে, নীলিম ছায়ার মধ্যে—ক্রমশ বিলীন হইয়া গিয়াছে।

আরো দূরে, জলাশয়ের অপর পারে, বাম কূলে,—জীবন-উত্তমের উদ্দাম স্ফূর্ত্তি। প্রথমেই হিন্দু বণিক্‌দিগের নগর—"মাতাঞ্চেরি";—শত-শত ক্ষুদ্র গৃহ উদ্ভিজ্জশ্যামল ভূমির উপর অধিষ্ঠিত। একটি উপসাগর-সূত্রে, মহাসমুদ্রের সহিত এই নগরীর যোগাযোগ রক্ষিত হইয়াছে। এই উপসাগরে অসংখ্য নৌকা নোঙর করিয়া আছে; এগুলি সেকেলে-ধরণের নৌকা;—পাল ও অদ্ভুত মাস্তুল বিশিষ্ট। এই নৌকাগুলি আরবসমুদ্রের উপর দিয়া ক্রমাগত যাতায়াত করে, মস্কটের সহিত বাণিজ্য করে, পারস্য-উপসাগরের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ করে এবং বসোরা-নগরে মসলা-সামগ্রী ও শস্যাদি লইয়া যায়। তার পর, আরো দূরে—পোর্টুগী ও ওলন্দাজদিগের পুরাতন কোচিন। এখন ইহা অন্য প্রভুদের হস্তে। উহাদের একটা বন্দর আছে,—সেইখানে আধুনিক জাহাজ-গুলার ধোঁয়া-চোং হইতে কৃষ্ণবর্ণ ধূমরাশি নিরন্তর উচ্ছ্বসিত হইতেছে।

এই বিলের মাঝখানে,—ঐ পরস্পর-বিসদৃশ তিনটি নগরের সংস্রব হইতে দূরে,—একটি তরুসমাচ্ছন্ন দ্বীপ আছে;—এখন সেই দ্বীপের অভিমুখে আমার নৌকা চলিতে লাগিল। হরিৎ-শ্যামল উদ্ভিজ্জ-রাশির মধ্যে নিমজ্জিত কতকগুলা শাদা-শাদা সোপানপংক্তি, একটা শাদা ঘাট, একটি শাদা রঙের পুরাতন প্রাসাদ। আমি যে রাজার অতিথি, সেই রাজার আদেশক্রমে বোধ হয় ঐখানেই আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহার যেরূপ জীর্ণ ও "পোড়ো" অবস্থা, তাহাতে মনে হয়, ঐ সকল শাদ্বল-ভূমির উপর, ঐ সকল শাখাপল্লবের মধ্যে—কোন নিদ্রাময়া ঔপন্যাসিক রূপসী বাস করে: সন্ধ্যা নিকটবর্ত্তী হওয়ায়, এই বিজন দ্বীপটি আরো বিষণ্ণ আকার ধারণ করিল।

কিলোন্-নগরীর ন্যায়, এখানেও শুভ্র-বসনধারী ভারতীয় ভৃত্যগণ আমাকে একটি গোলাপের তোড়া দিবার জন্য, শাদা সিঁড়ির উপর দৌড়িয়া-আসিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। আমি এখন, একটি সুন্দর পুরাতন উদ্যানের মধ্য দিয়া চলিতেছি;—সেকেলে-ধরণের সোজা-সোজা রাস্তা; ধারে-ধারে জুঁইগাছ, গোলাপগাছ।

এই দ্বীপের মধ্যে একটিমাত্র বাড়ী, আর সেই বাড়ীর মধ্যে আমি একা। যে শতাব্দীতে, কোচিনরাজ্য ওলন্দাজদিগের অধিকারে ছিল, তখন এই বাড়ীটিতে ওলন্দাজ শাসনকর্ত্তা বাস করিতেন। ইহা দুর্গের ন্যায় পিণ্ডাকৃতি; এবং ইহার অলিন্দ, বারান্দা—সুন্দর মসজিদ্-ধরণের খিলানে বিভূষিত। অভ্যন্তরে, সেকালের গুরুময়ী বিলাসিতা। চুনকাম-করা প্রকাণ্ড বড় বড় ঘর;—তাহাতে প্রাচীনকালের মাদুর বিছানো;—এপ্রকার সূক্ষ্মধরণের মাদুর আজকাল আর দেখা যায় না।

পুরাতন সুদুর্লভ কাঠ-কাঠরার কাজ; অতি পুরাতন য়ুরোপীয় আদর্শে নির্ম্মিত খোদাই-কাজ-করা ঘরের আসবাব; দেয়ালে জল-রঙের ছবি;—এই ছবিগুলা সপ্তদশ-শতাব্দীর আমষ্টর্ডামের চিত্রকলার নমুনা। কি রাত্রে, কি দিনে,—দর্জাগুলা কখনই বন্ধ করা হয় না। এই প্রত্যেক দর্জার সম্মুখে এক-একটা দাঁড়ায়না-পর্দ্দা;—তাহাতে ম্লান-মনোহর পীতবর্ণ রেশমের কাপড় টানা।

ভৃত্যেরা আমাকে জানাইল,—আমি যে রাজার অতিথি, তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না; কেন না, তাঁহার অশৌচ—এখন তিনি শ্রাদ্ধশান্তি করিতেছেন। কোচিনরাজ্যের অল্পবয়স্ক যুবরাজ—নিতান্ত শিশু—সম্প্রতি স্বকীয় কৃষ্ণবর্ণ কুসুমনেত্র চিরতরে নিমীলিত করিয়াছেন; তাই, প্রাসাদের সমস্ত লোক এখন শোকময়।

এই রাজকীয় বিজনতার মধ্যে না আসিয়া, মাত্তাঞ্চেরি-নগরে অবস্থিতি করিলে আমার পক্ষে ভাল হইত। সেখানে একটা ক্ষুদ্র পান্থনিবাসে থাকিলেও, আজ আমি সায়াহ্নে, তত্রত্য জনতার মধ্যে মিশিয়া, তাহাদের প্রকৃত জীবন প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম!...এখানে ও ত্রিবন্দুরে—আমি ভারতবর্ষে থাকিয়াও যেন নাই। বিশিষ্ট-দর্শন নিঃশব্দচারী ভৃত্যেরা, মার্জ্জারবৎ-পদসঞ্চারে, খাঁজ-কাটা-খিলান-বিলম্বিত সমস্ত দীপগুলি জ্বালিয়া দিল। নূতন-ধরণে পুষ্পপল্লবে সুসজ্জিত টেবিলের ধারে বসিয়া আমার "কেয়েদির ভোজ" শেষ হইলে, পর,—নবশতাব্দীর প্রথম সন্ধ্যার অভ্যুদয় দেখিবার জন্য আমি উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। যেখানে নির্ব্বাপিতপ্রায় জ্বলন্ত অঙ্গারের রং এখনো পর্য্যন্ত রহিয়াছে—সেই পশ্চিম দিগন্তপটের উপর, এই দ্বীপ-তরুগুলি, ঘোর-কৃষ্ণবর্ণ কত-কি দুর্ব্বোধ্য চিত্রাক্ষর অঙ্কিত করিতেছে। এখনো, উদ্যানবীথির উর্দ্ধদেশে—উত্তপ্ত নভস্তলে, সেই সন্ধ্যাচর জীব—পেচক ও বৃহৎ-জাতীয় বাদুড় বিচিত্র চক্রগতিতে উড়িয়া বেড়াইতেছে।

তাহার পর, সমস্ত আকাশে, মিট্‌মিট্‌ করিয়া তারা জ্বলিতে লাগিল—সহসা রাত্রি আসিয়া পড়িল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আগমন।

তখন রাত্রি আঁধার হ'ল
সাঙ্গ হ'ল কাজ—
আমরা মনে ভেবেছিলেম
আস্‌বে না কেউ আজ।

মোদের গ্রামে দুয়ার যত
রুদ্ধ হ'ল রাতের মত,
দুয়েক জনে বলেছিল
"আস্‌বে মহারাজ।"
আমরা হেসে বলেছিলেম
"আস্‌বে না কেউ আজ!"

দ্বারে যেন আঘাত হ'ল
শুনেছিলেম সবে,
আমরা তখন বলেছিলেম
বাতাস বুঝি হবে!
নিবিয়ে প্রদীপ ঘরে ঘরে
শুয়েছিলেম আলসভরে,
দুয়েক জনে বলেছিল
"দূত এল বা তবে!"
আমরা হেসে বলেছিলেম
"বাতাস বুঝি হবে!"

নিশীথরাতে শোনা গেল
কিসের যেন ধ্বনি।
ঘুমের ঘোরে ভেবেছিলেম
মেঘের গরজনি।
' ক্ষণে ক্ষণে চেতন করি'
কাঁপ্‌ল ধরা থরহরি,
দুয়েক জনে বলেছিল
"চাকার ঝনঝনি।"
ঘুমের ঘোরে কহি মোরা
"মেঘের গরজনি।"

তখনো রাত আঁধার আছে,
বেজে উঠ্‌ল ভেরী,
কে ফুকারে—"জাগ সবাই,
আর কোরো না দেরি!

বক্ষ'পরে দু'হাত চেপে
আমরা ভয়ে উঠি কেঁপে,
দুয়েক জনে কহে কানে—
"রাজার ধ্বজা হেরি!"
আমরা জেগে উঠে বলি
"আর তবে নয় দেরি!"

কোথায় আলো, কোথায় মাল্য,
কোথায় আয়োজন!
রাজা আমার দেশে এল
কোথায় সিংহাসন!
হায় রে ভাগ্য, হায় রে লজ্জা,
কোথায় সভা কোথায় সজ্জা!
দুয়েক জনে কহে কানে—
"বৃথা এ ক্রন্দন—
রিক্তকরে শূন্যঘরে
কর অভ্যর্থন!

ওরে দুয়ার খুলে দেরে—
বাজা শঙ্খ বাজা!
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা!
বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরি ঝিলিক্ ঝলে,
ছিন্নশয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা!
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এলো
দুঃখরাতের রাজা!

রাজা ও প্রজা।

ইংরেজ অনেকসময় বলিয়া থাকে যে, তরবারির সাহায্যেই ভারতে তাহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তরবারির সাহায্যেই ভারতকে চিরদিন পদানত রাখিতে হইবে।

কথাটা সত্য হইলেও সাধু হইত না। বলপূর্ব্বক তুমি একদিন আমাকে তোমার পদানত করিতে পারিয়াছিলে বলিয়া, চিরদিনই যে আমাকে তোমার পদানত করিয়া রাখিবার একটা ধর্ম্মানুগত বা ন্যায়-সঙ্গত দাবি জন্মিল, তাহা নহে। আমা অপেক্ষা প্রবল বলিয়া তুমি আমাকে পদদলিত করিতে পার, কিন্তু তাহাতে আমার অসারতা প্রতিপন্ন হইলেও তোমার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে না।

কথাটা কিন্তু আদোপেই সত্যও নহে। ইংরেজ আপনার সঙীনের সাহায্যে বিশাল ভারতভূমে এই একচ্ছত্র রাজত্ব লাভ করে নাই, প্রধানত ও মূলত ভারতবাসীর তরবারির সাহায্যেই তাহার এই অপরিসীম সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর আজও ভারতের নিশ্চেষ্ট ও নির্বীর্য্য প্রকৃতিপুঞ্জের নীরব আনুকূল্যেই সে আপনার এই অনন্ত-প্রতিদ্বন্দ্বী অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেছে।

প্রজার এই আনুকূল্যের উপরে সর্ব্বত্রই রাজসিংহাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করিয়া থাকে। কারণ রাজা কুত্রাপি শুদ্ধ আপনার প্রহরি-পাহারার বলে রাজ্যশাসন করিতে পারে না। জনমণ্ডলীর স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ শক্তিরাশিই প্রচ্ছন্নভাবে রাজশক্তি-রূপে প্রকাশিত হইয়া, এই সকল সামান্য প্রহরি-পাহারাকে শক্তিশালী করিয়া তোলে। এইরূপে সর্ব্বত্রই জনগণ আপনা-দিগের স্বাভাবিক শক্তিকে সংহত করিয়া রাজ-আধারে প্রতিষ্ঠিত করে এবং তাহার সাহায্যে আপনাদিগের শাসনসংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া লয়।

ভারতে ইংরেজ-প্রভুশক্তিও এই সার্ব্বভৌমিক বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া এদেশের প্রজাশক্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আমাদের শক্তিতেই শক্তিশালী হইয়া ইংরেজ এই সুবিশাল ভারতসাম্রাজ্য শাসন করিতেছে। অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ইংরেজ সকল সময়ে ইহা ভাবে না, ঘোরতম-মোহাচ্ছন্ন হইয়া আমরাও ইহা দেখি না,—ইহাই তাহার ঘনঘন দুর্গতির ও আমা-দিগের নিরবচ্ছিন্ন দুর্গতির একমাত্র মুখ্য-কারণ।

উপনিষদে এরূপ গল্প আছে যে, একদা অসুরসংগ্রামে জয়লাভ করিয়া দেবতারা অত্যন্ত অভিমানী ও আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়েন, এবং "আমাদেরই এই মহিমা," "আমরাই বিজয়ী হইয়াছি" এইরূপ ভাবিতে আরম্ভ করেন। তখন সহসা দেবসভা-

সমীপে এক অদ্ভুতদর্শন পুরুষ প্রকাশিত হইলেন। দেবতারা তাঁহার পরিচয় লইবার জন্য প্রথমত অগ্নিকে, পরে বরুণকে, পরে মরুৎকে প্রেরণ করেন। ইঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া সেই অদ্ভুতদর্শন পুরুষ ইঁহাদের সম্মুখে একখণ্ড তৃণ রাখিয়া, ইঁহাদের শক্তিপরীক্ষা করেন। অগ্নি আপনার সমুদয় শক্তিপ্রয়োগেও সেই তৃণখণ্ড দগ্ধ করিতে পারিলেন না, বরুণ তাহা ভাসাইতে পারিলেন না, মরুৎ তাহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে ক্রমে ইঁহারা পরাভব মানিয়া দেবসভায় ফিরিয়া আসিলে, দেবতারা দেবরাজ ইন্দ্রকে এই যক্ষের পরিচয় লইবার জন্য প্রেরণ করিলেন। তখন সেই পুরুষ শূন্যে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন এবং সেই আকাশে ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী উমা হৈমবতী প্রকাশিত হইয়া, 'ইনি যে সেই ব্রহ্ম, যাঁহার শক্তিতে দেবতারা জয়ী হইয়াছেন', ইন্দ্রকে এই উপদেশ দান করিলেন।

ব্রহ্মের শক্তিতে অসুরসংগ্রামে জয়লাভ করিয়া দেবতারা আত্মবিস্মৃত ও মোহাচ্ছন্ন হইয়া যেমন "আমরাই বিজয়ী হইয়াছি", "আমাদেরই এই মহিমা"—এইরূপ ভাবিতেছিলেন, ভারতের শক্তিতে এই বিশাল ভারতসাম্রাজ্য অধিকার করিয়া আত্মবিস্মৃত ইংরেজও আজ সেইরূপই ভাবিতেছে। কিন্তু একবার যদি ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জ কিয়ৎপরিমাণে আত্মস্থ হইতে পারে এবং ভারতের এই প্রচ্ছন্ন প্রজাশক্তি যদি একবার কেন্দ্রীভূত, ঘনীভূত ও প্রকট হইয়া দাঁড়ায়, সেই যক্ষের সমক্ষে ইংরেজ আপনার বিপুল জ্ঞানবিজ্ঞানের ও অদ্ভুত অস্ত্রশস্ত্রের সমগ্রশক্তি প্রয়োগ করিয়াও তৃণাদপি লঘুতর তৃণখণ্ড পর্য্যন্ত বিচলিত বা বিদগ্ধ করিতে পারিবে না।

ইংরেজকে আপনার কল্যাণের জন্যই ইহা বুঝিতে হইবে যে, যেমন তাহার স্বদেশে, সেইরূপ জগতের সর্ব্বত্রই প্রজাশক্তি হইতে রাজশক্তি উৎপন্ন হয়। 'প্রজার সম্পূর্ণ আনুকূল্যলাভ না করিলে রাজশক্তি' শুদ্ধ সৈন্যসামন্তের সাহায্যে কুত্রাপি আত্মরক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। প্রজার আনুকূল্যই রাজশক্তির মূলাধার। সৈন্যসামন্ত এই আনুকূল্যলাভে রাজাকে সাহায্য করে মাত্র, কিন্তু এই আনুকূল্য ব্যতীত তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। ইহাই রাজনীতির মূলসূত্র। জড়রাজ্যে মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকে একান্ত অগ্রাহ্য করিয়া যেমন কোন জড়বস্তু শূন্যে স্থিতি করিতে পারে না, রাজনীতিক্ষেত্রে সেইরূপ প্রকৃতিপুঞ্জের শক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া ও তাহাদের আন্তরিক আনুকূল্য বা প্রাতিকূল্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া কোন রাজশক্তি কুত্রাপি স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে না। রাজা প্রজাকে ভয়বিহ্বল করিয়া নিশ্চেষ্ট করিতে পারে, বিবিধ কুটিল কৌশলজাল বিস্তারপূর্ব্বক তাহার জ্ঞানবীর্য্য হরণ করিয়া তাহাকে অসাড় পুত্তলিকায় পরিণত করিতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবেই হউক আর পরোক্ষভাবেই হউক, তাহার আনুকূল্যলাভ না করিলে কিছুতেই আপনার প্রভুশক্তিকে স্থির রাখিতে পারে না।

এদেশে আসিয়া অবধি ইংরেজও বিবিধ

কারণে প্রকৃতিপুঞ্জের আনুকূল্যলাভ করিয়া আসিয়াছিল। দিল্লির সিংহাসন ভাঙিয়া পড়িলে দেশময় একটা প্রবল শক্তিদ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। সেই ভীষণ শক্তিসংঘর্ষের মধ্যে প্রকৃতিপুঞ্জের ধনপ্রাণ রক্ষা পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে এবং জনমণ্ডলী একটা দুর্ব্বিষহ চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের মধ্যে বাস করিতে আরম্ভ করে। ইংরেজ নানা ছলে-বলে-কৌশলে দেশমধ্যে আপনার প্রভুশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্রমে সে চাঞ্চল্য ও সে আতঙ্ক নিবারণ করে এবং বহুলরাষ্ট্র-বিপ্লববিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষে শান্তিস্থাপন করিয়া প্রথম হইতেই প্রজাবর্গের আন্তরিক আনুকূল্য লাভ করিতে আরম্ভ করে। দেশীয় ভূপতিবর্গের সঙ্গে নানা ছল ধরিয়া পুনঃপুন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া, তখন হইতেই দেশীয় সিপাহীর সাহায্যে, আপনার অসাধারণ কুটিলবুদ্ধিবলে ইংরেজ এক অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক প্রতাপ প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও ভয়ে অভিভূত করিয়া ফেলে, এবং এই অদ্ভুত মায়াপ্রভাবেও, অন্যদিক্ হইতে, ভারতের ভয়বিস্ময়বিমূঢ় প্রজাপুঞ্জের আনুকূল্যলাভ করে। এইরূপে প্রথম হইতেই ভারতের প্রজাসাধারণের নীরব আনুকূল্যের উপরেই ইংরেজের প্রভুশক্তি এদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

ইংরেজ তখনো মোহাচ্ছন্ন হইয়া আত্মবিস্মৃত হয় নাই; ভারতের প্রজামণ্ডলীও তখনো পর্য্যন্ত নিরস্ত্র ও নির্বীর্য্য হইয়া নূতন রাজশক্তির অনিষ্টসাধনে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পড়ে নাই। ইংরেজ এইজন্য সেই সময়ে প্রজারঞ্জনের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিত। আপনার স্বার্থ সে আজও পারিলে ছাড়ে না, তখনো ছাড়িত না, কিন্তু প্রজার মনস্তুষ্টিসম্পাদনের উপরেই যে তাহার সর্ব্ববিধ স্বার্থসাধন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে, এই জ্ঞান তখন তাহার অন্তরে নিয়ত জাগরূক ছিল। এইজন্যই সে তখন সর্ব্বদা প্রজাবর্গের সমক্ষে আপনার উদার কল্যাণনীতি প্রকট করিবার জন্য ব্যস্ত ছিল।

ইংরেজ-রাজনীতি তখন সত্যসত্যই অনেকটা উদার হইয়া উঠিয়াছিল। ফরাসী-বিপ্লব পাশ্চাত্যজগতের সমক্ষে যে এক উচ্চ, দিব্য, বিশ্বজনীন স্বাধীনতা ও কল্যাণের আদর্শ ধারণ করিয়াছিল, বণিকবৃত্ত ইংরেজও একেবারে তাহার প্রভাব হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিতে পারে নাই। অজ্ঞানে হউক সজ্ঞানে হউক, ইংরেজও সে উদার ভাব ও আদর্শ, অতি সামান্যমাত্রায় হইলেও, গ্রহণ করিয়াছিল। জনমণ্ডলীর স্বাধীনতাবিস্তার এবং বিশ্বমানবের সেবার জন্য ইংরেজের মনেও তখন একটা সাময়িক আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়াছিল। সুতরাং সে সময়ে ভারতে ইংরেজ-রাজনীতিও কিছুদিনের জন্য একটা উদার কল্যাণোজ্জ্বল বিশ্বপ্রেমের বেশ পরিধান করিয়া আমাদের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই মোহিনী মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াই ইংরেজ ভারতের প্রজামণ্ডলীর সরল চিত্ত হরণ করিয়াছিল। ইংরেজের রাজবিধি ও দণ্ডবিধি প্রাচীন ও চিরাগত বিবিধবৈষম্যপূর্ণ ভারতবর্ষে এক সর্ব্বজনীন সাম্যমন্ত্র প্রচার করিতে লাগিল। ইংরেজের ধর্ম্মাধিকরণের সম্মুখে জমিদার-রায়ৎ, ধনি-নির্ধন,

ব্রাহ্মণ-শূদ্র, সকলই সমান হইয়া গেল। এমন কি, প্রজাও রাজার বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ আনিয়া ন্যায়বিচারপ্রার্থী হইবার অজ্ঞাতপূর্ব্ব অধিকার পাইয়া রাজাপ্রজার বিশাল ভেদ পর্য্যন্ত কিয়ৎপরিমাণে বিস্মৃত হইতে লাগিল। এইরূপে একদিকে যেমন ইংরেজের দণ্ডপ্রতাপে, সেইরূপ অন্যদিকে তাহার এই উদার বিশ্বজনীন সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শে অভিভূত হইয়া এদেশের নেতৃবর্গ ইংরেজকে স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দচিত্তে আপনাদের নবোন্মেষিত জাতীয়জীবনের নেতৃত্বে বরণ করিয়া, পরিণামে জাতীয় স্বাধীনতালাভের লোভে, স্বাধীনভাবে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

পশুবলপ্রয়োগে ইংরেজ বিশালসাগরোপম ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের উপরে এরূপ অপ্রতিহত ও অনন্যপ্রতিযোগী প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিত না। ভারতে শৌর্য্যবীর্য্যের একান্ত অভাব এখনো নাই, তখন তো আরো ছিল না। আজও গোরাসৈন্য অপেক্ষা দেশীয় সিপাহীগণই ইংরেজরাজের প্রধানতম সেনাবল হইয়া রহিয়াছে। যে দেশের লোক প্রারব্ধে বিশ্বাস করে, নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য বিধান সর্ব্বদা স্বীকার করে, যাহারা মৃত্যুভয় জানে না,—তাহারা স্বেচ্ছায় নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ পশুবলে আবদ্ধ হয় না। ফলত শুদ্ধ পশুশক্তির উপরে ভারতে ইংরেজের প্রভুশক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, সিপাহীবিদ্রোহের প্রলয়বন্যায় তাহা কখনো রক্ষা পাইত না। সিপাহীরাই তখন ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল, সাধারণ প্রজাবর্গ তাহার প্রতি তখনো বিমুখ হয় নাই। তাহারা যদি একটু বিমুখ হইয়া দাঁড়াইত, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের ইতিহাসে এক মহাপ্রলয় উপস্থিত হইত। সে দেশব্যাপী দাবানল নির্ব্বাণ করা ইংরেজের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব হইত না। ভারতের প্রজামণ্ডলীর আনুকূল্যেই সেই দুর্দ্দিনে এদেশে ইংরেজ আপনার প্রভুশক্তিকে অটুট রাখিতে পারিয়াছিল। সুদিনে লোকে দুর্দ্দিনের কথা ভুলিয়া যায়, ইংরেজও সে সকল কথা আজ ভুলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইতিহাস তাহা ভুলিবে না।

প্রজার আনুকূল্যের মূল্য তখন বস্তুতই ইংরেজ বেশ ভাল করিয়া বুঝিত। সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে শ্বেতাঙ্গ নরনারী ও অপোগণ্ড শিশুদিগের প্রতিও যে নির্ম্মম নির্যাতন হইয়াছিল, তাহা ইংরেজ বহুদিন ভুলিতে পারিবে না। কি জানি ভুলিয়া যায়, এইজন্য সে যত্নপূর্ব্বক স্থানে স্থানে তাহার স্মৃতিচিহ্ন পর্য্যন্ত রাখিয়া দিয়াছে। কিন্তু সেই সকল নৃশংস ব্যাপারের প্রথম তীব্রযাতনা কিঞ্চিন্মাত্রও প্রশমিত হইতে না হইতেই, ইংরেজ ভারতের প্রজাসাধারণের প্রতি যে সদ্ভাব ও উদারতা প্রকাশ করিয়াছিল, মানুষের কথা দূরে থাকুক, দেবতার পক্ষেও তাহা দুঃসাধ্য বলিয়াই মনে হয়। সেই ভীষণবিদ্রোহাবসানে, ইংলণ্ডের রাণী বণিক্‌কোম্পানীর হস্ত হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার সময়, প্রজার আনুকূল্য ব্যতীত রাজ্যরক্ষা অসাধ্য ভাবিয়াই, ন্যায় ও সাম্যনীতির উপরেই ভারতে ব্রিটিশপ্রভুশক্তি চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া এই প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়াছিলেন।

সেই উদারনীতির গুণেই ভারতে ইংরেজ-প্রভুশক্তি এতটা-পরিমাণে প্রজাসাধারণের আনুকূল্যলাভ করিয়া আসিয়াছে।

ক্রমে ইংরেজ সে উদারনীতি বর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে ইংরেজের কোনই অপরাধ আছে বলিয়া মনে করি না। ইংরেজের সে উদারনীতি ধর্ম্মের দ্বারা প্রণোদিত হয় নাই, সঙ্কীর্ণ স্বার্থেরই উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আজও যদি আপনার স্বার্থরক্ষার জন্য সে উদারতা আবশ্যক মনে করিত, ইংরেজ প্রাণপণে তাহা অবলম্বন করিয়া চলিত। কিন্তু আজ ইংরেজ ভারতে অতয়পদ পাইয়াছে। প্রজা-মণ্ডলী দুর্ব্বল, নিঃস্ব, নিরস্ত্র ও নির্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজের সাম্যনীতি শ্বেত-কৃষ্ণের ভেদ নষ্ট করিতে পারে নাই, কিন্তু জমিদার ও প্রজার প্রাচীন পরস্পরমুখাপেক্ষী সম্বন্ধকে চিরদিনের জন্য ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। প্রজার উপরে জমিদারের আর তেমন অধিকার নাই। ইংরেজরাজত্বে জমিদার অপেক্ষা জমাদার প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজের শিক্ষায় ইতরভদ্রের মধ্যে প্রাচীন ঘনিষ্ঠতা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। যাঁহারা প্রাচীনকালে প্রকৃতিপুঞ্জের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাদের সে প্রভাব আজ নামশেষমাত্রেও বিদ্যমান নাই। যাঁহাদের পিতৃপুরুষদিগের পশ্চাতে সহস্র সহস্র লোক যাইয়া দাঁড়াইত, আজ তাঁহারা অশেষ অনুনয় করিয়াও দুচারিটি প্রকৃত অনুচর প্রাপ্ত হন না। ভারতের জনমণ্ডলী হীনবল, হীনবীর্য্য, নিরস্ত্র, বিচ্ছিন্ন, আত্মবিস্মৃত ও নেতৃবিহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজ আজ তাহাদের হইতে আর বিশেষ কোন বিপদ্ আশঙ্কা করে না।

প্রজা যেখানেই দুর্ব্বল, বিচ্ছিন্ন ও অনিষ্ট-সাধনে-অক্ষম হইয়া উঠে, সেখানেই রাজা প্রজারঞ্জনে বিমুখ হইয়া অত্যাচারপ্রবণ হয়। ইহা রাজনীতির সার্ব্বভৌমিক অভিজ্ঞতা। ইংরেজের আধুনিক অত্যাচারপ্রবণতা ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জের নিশ্চেষ্টতা ও বীর্য্য-হীনতারই প্রতিফল। ইংরেজ নহে, কিন্তু আমরাই ইহার জন্য দায়ী।

এখনো কিন্তু আমরা এইটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। এইজন্যই ইংরেজের নিন্দাবাদ ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের নিত্যকৃত্য হইয়া পড়িয়াছে। নিন্দায় নিন্দুকের প্রাণে একটা কৃত্রিম আরাম অনুভূত হয় বটে, কিন্তু নিন্দিতের প্রকৃতি কখনো পরিবর্ত্তিত হয় না। ইংরেজ আজ যাহা-কিছু করিতেছে, তাহার মূল মানবপ্রকৃতির মধ্যে। ইংরেজ আমাদিগের প্রতি যে ব্যবহার করিতেছে, তাহার স্থলাভিষিক্ত হইলে, আমরাও আমাদিগের অধীনস্থ জনমণ্ডলীর প্রতি ঠিক তাহাই করিতাম। জাপানের মহত্বে, জাপানের সংযমে ও আত্মত্যাগে, জাপানের ধর্ম্মভীরুতায় আজ জগৎ বিমুগ্ধ, বিস্মিত, নতশির হইয়া তাহাকে ধন্যবাদ করিতেছে। কিন্তু এই জাপান যদি বিশত-বর্ষাধিক কাল ইংরেজের মত একটা বিরাট্‌-কায় নির্বীর্য্য জাতির উপরে অপ্রতিহত-প্রভাবে রাজনৈতিক অধিকার ও আধিপত্য ভোগ করিতে সমর্থ হয়, তবে তাহার এ সকল সদ্‌গুণ বেশিদিন কখনই টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। প্রজা ও রাজা

পরস্পরে সর্ব্বদাই ঠিক পরস্পরের উপযোগী হইয়া থাকে। বিধাতা এ ক্ষেত্রে সর্ব্বদাই 'যোগ্যং যোগ্যেন' যোজনা করিয়া থাকেন। শক্তিশালী, সম্মিলনক্ষম, বীর্য্যবান্, স্বদেশ-হিতৈষী, স্বজাতিভক্ত প্রজামণ্ডলী যে রাজার অধীনে বাস করে, আপনাদিগের শক্তি ও সাধনাবলেই তাহাকে উদার, ন্যায়পরায়ণ, প্রজাবৎসল ও ধর্ম্মভীরু করিয়া তোলে। ইংলণ্ডের প্রজাপুঞ্জ শক্তিশালী, স্বাধীনতা-প্রিয় ও সম্মিলনক্ষম বলিয়া, ইংলণ্ডের রাজা প্রজাহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। প্রাচীনকাল হইতেই ইংরেজ নীরবে ও নিশ্চেষ্টভাবে কদাপি রাজকীয় অত্যাচার বহন করে নাই। অত্যাচারী, প্রজারঞ্জনবিমুখ ও প্রজার স্বার্থস্বত্বস্বাধীনতাসংরক্ষণে উদাসীন রাজার বিরুদ্ধে ইংরেজ সর্ব্বদাই অস্ত্রধারণ করিয়াছে। ইংরেজপ্রজাপুঞ্জ যদি নীরবে রাজকীয় অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিত,—সশস্ত্র হইয়া রাজা জোহনকে বেষ্টন করিয়া রাণিমিড্‌ক্ষেত্রে যদি তাহারা সঙ্গীনের অগ্রভাগে আপনাদের আবেদন রাজার হস্তে অর্পণ না করিত, তাহারা কদাপি ম্যাগ্‌নাকার্টা লাভ করিতে পারিত না। আবার প্রথম চার্লসের সময়ে, আপনাদিগের স্বাধীনতা ও ধর্ম্মবিশ্বাসকে রক্ষা করিবার জন্য ইংরেজপ্রজামণ্ডলী যদি অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে আপনাদিগের সংহত শক্তিরাশিকে প্রবলবেগে প্রয়োগ না করিত, এবং প্রজাদ্রোহিতা-অভিযোগে রাজাকে অভিযুক্ত করিয়া প্রকাশ্যভাবে তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না করিত, তবে আজ ইংরেজ সভ্যজগতে স্বাধীনজাতিরূপে এমন গৌরবলাভ করিতে পারিত না। ইংলণ্ডে আজ যে প্রকৃতিপুঞ্জের স্বাভাবিক স্বাধীনতা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে ও রাজকীয় অধিকার যে পদে পদে প্রজাপুঞ্জের স্বার্থ ও স্বাভিমতের অনুযায়ী হইয়া চলিতেছে, ইহা কেবল ইংরেজপ্রজাসাধারণের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মনির্ভরের ফল। যেমন ইংলণ্ডে, সেইরূপ অপর সর্ব্বত্রই, প্রজামণ্ডলীর শক্তিপ্রয়োগে রাজনৈতিক অধিকার প্রসারিত ও রাজকীয় শক্তি ও স্বেচ্ছাচারিতা সংযত হইয়াছে। ভারতের প্রজামণ্ডলী যদি সংযোগক্ষম, স্বদেশহিতৈষী, স্বজাতিভক্ত, বীর্য্যবান্ ও শক্তিশালী হইয়া উঠে, ভারতের রাজশক্তি অপরিহার্য্যরূপে উদার ও কল্যাণকারিণী হইয়া উঠিবে।

অতএব ইংরেজকে যেমন বুঝিতে হইবে যে, প্রজাশক্তির আনুকূল্যলাভ ব্যতীত ভারতে তাহার প্রভুত্ব স্থায়ী হইতে পারিবে না, সেইরূপ ভারতের প্রজাসাধারণকেও ইহা বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের আত্মশক্তি জাগ্রত, সংহত ও যথাযোগ্য বিষয়ে প্রযুক্ত না হইলে, এদেশে ইংরেজপ্রভুশক্তি কদাপি জাতীয়জীবনের চরিতার্থতাসম্পাদনের সহায় হইতে পারিবে না। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের রাজাও আপনার প্রকৃত কল্যাণের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, প্রজামণ্ডলীও আজ পর্য্যন্ত যথাবিহিতরূপে আপনার কর্ত্তব্যপথ অবলম্বন করিতে সমর্থ হয় নাই।

আধুনিক ভারতবর্ষে প্রজানীতি এইজন্য রাজার অনুগ্রহপ্রত্যাশায় বিমূঢ় হইয়া

কেবলই রাজদ্বারে হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আবেদন, প্রার্থনা ও বিধিগর্ভ আন্দোলনের নিষ্ফল প্রয়াসেই আজ পর্য্যন্ত আমাদিগের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ আপনাদিগের ও স্বদেশবাসীদিগের সমুদায় শক্তি ও সময় প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে প্রজাসাধারণের আত্মশক্তি যাহাতে জাগ্রত হয়, তৎপ্রতি অনুরূপ মনোনিবেশ করেন নাই। প্রজাশক্তি জাগ্রত হইয়া আপনাকে রাজনীতিক্ষেত্রে যথাযোগ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলে পর, এ সকল আন্দোলন-আবেদনের দ্বারা রাজনৈতিক অধিকার প্রসারপ্রাপ্ত হইতে পারে,—হইয়া থাকে, স্বীকার করি। কিন্তু ইংলণ্ডে ও মার্কিণে প্রজাশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানে রাজনৈতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানাদিতে প্রজাসাধারণের মতামত আপনার অনন্যপ্রতিযোগী প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। সে সকল দেশে প্রজাশক্তিই সাক্ষাৎভাবে রাজশক্তিকে প্রতিষ্ঠা করে, প্রজাপ্রতিনিধিগণই সে দেশে রাজকীয় অধিকার ও শাসনসংরক্ষণের সমুদায় ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকেন। সে সকল দেশে প্রজার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরে গবর্মেণ্টের সমুদায় কার্য্য স্বল্পবিস্তর নির্ভর করে। সুতরাং সেখানে প্রজামণ্ডলীকে কোন একটা বিষয়ে প্রণোদিত করিতে পারিলে, সহজেই তদ্দ্বারা রাজকীয় ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রিত ও সংযত করিতে পারা যায়। রাজমন্ত্রিগণ প্রজামণ্ডলীর অভিমতানুযায়ী কার্য্য না করিলে পদচ্যুত হইয়া থাকেন বলিয়া, যাহা-কিছুতে তাঁহাদের প্রতি প্রজাবর্গের বিরুদ্ধমত বা বিরুদ্ধভাব জাগ্রত হয়, তাহাকে তাঁহারা সহজেই সর্ব্বদা ভয় করিয়া চলেন। এইজন্য সে সকল দেশে আন্দোলন-আবেদনাদি সর্ব্বদাই ঈপ্সিতফলদানে সমর্থ হয় এবং সে সকল দেশে এই প্রণালীর রাজনৈতিক আন্দোলন ভিক্ষাবৃত্তির সমপর্য্যায়ভুক্ত হয় না। কিন্তু এদেশে প্রজাশক্তি এখনো জাগ্রত হয় নাই। রাজকীয় অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানাদিতে প্রজামণ্ডলীর যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠা এখনো হয় নাই। এখানে রাজা বা রাজমন্ত্রী বা রাজকর্ম্মচারিগণ কেহই প্রজামুখাপেক্ষী নহেন, প্রজার মতামতের উপরে তাঁহাদের পদের ও কর্ম্মের স্থায়িত্ব নির্ভর করে না। বিলাতের প্রজাবর্গ আপনাদিগের প্রতিনিধিসভার সাহায্যে ভারতের শাসনসংরক্ষণাদির সমুদায় ব্যবস্থা করিয়া থাকে। বড়লাট, ছোটলাট, জঙ্গীলাট, এ সকলই ভারতের প্রজামণ্ডলীর মতামতনিরপেক্ষভাবে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। বিলাতের লোকের নিকটে ইঁহারা আপনাদিগের কর্ম্মের জন্য দায়ী, আমাদিগের দেশের প্রজামণ্ডলীর নিকটে নহেন। সুতরাং এখানে রাজনৈতিক আন্দোলন ও আবেদনাদি অনন্যোপায় হইয়াই সর্ব্বদা ভিক্ষাচর্য্যা অবলম্বন করিয়া থাকে। এতকাল ধরিয়া আমাদের সমুদায় রাজনৈতিক চেষ্টা ও অনুষ্ঠানাদি এইজন্যই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা কথঞ্চিৎ পরিমাণে উদরান্নের সংস্থান হইলেও, কখনো কুত্রাপি ভিক্ষুকের চরিত্রে শক্তিসঞ্চার হয় না। কিন্তু রাজনীতি কেবল যেন-তেন-প্রকারেণ জীবনোপায় সংগ্রহ করা নহে। রাজনীতি-

ক্ষেত্রে প্রজাশক্তি ও রাজশক্তি পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া, এক মহাসমরযুদ্ধে নিয়ত নিযুক্ত হইয়া থাকে। যেখানে প্রজা আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না, সেখানে রাজশক্তি নিরঙ্কুশভাবে আপনাকে পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রজাবর্গের ধনমান সকলই আত্মসাৎ করিয়া লয় এবং প্রকৃতিপুঞ্জকে নির্ধন, নির্বীর্য্য, হীনমতি ও হীনবৃত্ত এবং মনুষ্যত্বের সমুদায় উচ্চতর অধিকার ও গৌরব হইতে বঞ্চিত করিয়া পশুতুল্য করিয়া রাখে। এখানে ভিক্ষাবৃত্তি আর আত্মহত্যা একই কথা।

ভিক্ষার ধর্ম্মই এই যে, তাহা ভিক্ষুককে সর্ব্বদাই অশক্ত ও নির্বীর্য্য করিয়া তোলে। ভিক্ষুকের সফলতা আপনার শক্তিপ্রয়োগের উপরে নির্ভর করে না, অপরের অনুগ্রহের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে। ভিক্ষায় আত্মশক্তির উদ্বোধন অনাবশ্যক, দাতার অনুকম্পার উদ্রেক করিতে পারিলেই হইল। আমরাও এতকাল ধরিয়া রাজনৈতিক ব্যাপারে তাহাই করিয়া আসিয়াছি। আমরা আপনাদিগের শক্তিসাধন অপেক্ষা ইংরেজের অনুকম্পার উদ্দীপনকেই আমা-দিগের সমুদায় রাজনৈতিক প্রয়াসের প্রধান লক্ষ্য ধরিয়া, বিপুল অর্থব্যয় করিয়া এদেশে ও বিশেষত বিলাতে তুমুল আন্দোলন করিয়া আসিয়াছি। এতদিন ধরিয়া যদি আমরা এই শক্তি ও এই অর্থ দেশের প্রজাসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ও সংযোগসাধনের জন্য ব্যয় করিতাম, আজ আমাদের মধ্যে এমন এক প্রবল শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিত যে, সেই শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া ইংরেজের সাধ্য ও সাহস হইত না যে, একমুহূর্ত্তের জন্যও এদেশের রাজশক্তিকে শুদ্ধ আপনার স্বজাতীয়ের বিবিধ স্বার্থসাধনে নিযুক্ত করে।

এতদিন এইরূপ আন্দোলনের একটা সামান্য যৌক্তিকতাও ছিল। আমরা এতকাল ইংরেজকে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি। ইংরেজও এতকাল বলিয়া আসিয়াছিল যে, ভারতের প্রজাপুঞ্জের সর্ব্ববিধ কল্যাণসাধনই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। এই প্রাচীনজাতিকে অবনতির নিম্নতম স্তরে প্রাপ্ত হইয়া হাতে ধরিয়া জাতীয়জীবনের উচ্চতম স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই সে কৃতার্থ হইবে। চির-দিন ভারতকে আপনার পদলগ্ন করিয়া রাখা ইংরেজশাসনের লক্ষ্য নহে, কিন্তু শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিস্তার করিয়া ক্রমে জগতের শ্রেষ্ঠজাতিসকলের সমকক্ষ করিয়া এই দেশের প্রকৃতিপুঞ্জকে সভ্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই তাহার চরম লক্ষ্য। এই সকল স্তোতবাক্যে ইংরেজ এতকাল আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, হয় ত এক সময়ে তাহার আন্তরিক ভাবও এইরূপই ছিল। যতদিন আমরা ইংরেজকে বিশ্বাস করিতাম, ততদিন ইংরেজের নিকটে আত্মনিবেদন এতটা হীনকার্য্য ছিল না। কিন্তু এই প্রাচীন আদর্শ ইংরেজ এখন প্রকাশ্যভাবে পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যতদিন ভারতে ব্রিটিশ-প্রভুশক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ততকাল ভারতের প্রজাপুঞ্জকে সর্ব্ববিষয়ে আপনা-দিগের স্বদেশে ইংরেজের পদানত থাকিতে

হইবে, ইংরেজ ইহা অসঙ্কোচে আজ বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঘোর দুর্দ্দিনে, সিপাহী-বিদ্রোহের অবসানে ইংরেজরাজমহিষী যে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান ইংরেজরাজপুরুষ টীকাটিপ্পনী করিয়া কার্য্যত তাহাকে বর্জ্জন করিয়াছেন। এই সকল কারণে এখন আর প্রাচীন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলে চলিবে না। এখন দেশের প্রজা-শক্তিকে যদি জাগ্রত করিতে পারা যায়, তবেই আমাদিগের জাতীয়জীবনের সার্থকতা সম্ভব হইবে; অন্যথা নহে।

আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন-আলোচনাকে এইজন্য এখন অন্তর্মুখীন হইতে হইবে। ইংরেজের অনুকম্পার আশা পরিত্যাগ করিয়া, আমাদিগকে এখন আত্মশক্তি জাগ্রত করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। যদি আপনারা আপনাদিগের উদ্ধারপথ খুঁজিয়া লইতে পারি, তবেই আমাদের মুক্তি আছে—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়—মুক্তির অন্য কোন পথ নাই।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

দুর্ভাগ্য।



তোমার এ পুণ্যস্বচ্ছ জাহ্নবীর তীরে
হে বঙ্গজননি তব কুটীরে কুটীরে
যে পুরাণো শান্ত শক্তি ছিল সঙ্গোপনে,
আজি কোন্ বায়ুবেগে কোন্ শুভক্ষণে
এ ধূমান্ধ নগরীর বাতায়নপথে
প্রবেশিল তারি কণা আজি কোনমতে।
সন্তানের মৃতদেহে করেছ সঞ্চার
ঈষৎ চেতনা, তাই আশা বাঁচিবার।
নাহি তবু বল মনে নাহি বীর্য্য দেহে,
তাই আজি নাহি আশা এ দরিদ্রগেহে।
হিংসার প্রলয়বাণ চাহে ত্যজিবারে
পরেরে নাশিতে; তবু দুর্ভাগা না পারে
মঙ্গল-শান্তির তরে দিতে বলিদান
আপনার স্বার্থপুষ্ট দীনহীন প্রাণ।

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অবস্থা ও ব্যবস্থা।*

(৯ই ভাদ্র শুক্রবার টাউনহলে পঠিত

আজ বাংলাদেশে উত্তেজনার অভাব নাই, সুতরাং উত্তেজনার ভার কাহাকেও লইতে হইবে না। উপদেশেরও যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাহা আমি মনে করি না। বসন্তকালের ঝড়ে যখন রাশিরাশি আমের বোল ঝরিয়া পড়ে, তখন সে বোলগুলি কেবলি মাটি হয়, তাহা হইতে গাছ বাহির হইবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তেমনি দেখা গেছে, সংসারে উপদেশের বোল অজস্র বৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই তাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হয় না, সমস্ত মাটি হইতে থাকে।

তবু ইহা নিঃসন্দেহ যে, যখন বোল ঝরিতে আরম্ভ করে, তখন বুঝিতে হইবে, ফল ফলিবার সময় সুদূরে নাই। আমাদের দেশেও কিছুদিন হইতে বলা হইতেছিল যে, নিজের দেশের অভাবমোচন দেশের লোকের নিজের চেষ্টার দ্বারাই সম্ভবপর, দেশের লোকই দেশের চরম অবলম্বন, বিদেশী কদাচ নহে, – ইত্যাদি; নানা মুখ হইতে এই যে বোলগুলি ঝরিতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা উপস্থিতমত মাটি হইতেছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ভূমিকে নিশ্চয়ই উর্ব্বরা করিতেছিল এবং একটা সফলতার সময় যে আসিতেছে, তাহারও সূচনা করিয়াছিল।

অবশেষে আজ বিধাতা তীব্র উত্তাপে একটি উপদেশ স্বয়ং পাকাইয়া তুলিয়াছেন। দেশ গতকল্য যে সকল কথা কর্ণপাত করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করে নাই, আজ তাহা অতি অনায়াসেই চিরন্তন সত্যের ন্যায় গ্রহণ করিতেছে। নিজেরা যে এক হইতে হইবে পরের দ্বারস্থ হইবার জন্য নহে, নিজেদের কাজ করিবার জন্য, এ কথা আজ আমরা একদিনেই অতি সহজেই যেন অনুভব করিতেছি। বিধাতার বাণীকে অগ্রাহ্য করিবার জো নাই।

অতএব আমার মুখে আজ উত্তেজনা ও উপদেশ অনাবশ্যক হইয়াছে—ইতিহাসকে যিনি অমোঘ ইঙ্গিতের দ্বারা চালনা করেন, তাঁহার অগ্নিময় তর্জ্জনী আজ দেশের সকলের চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

এখন এই সময়টাকে বৃথা নষ্ট হইতে দিতে পারি না। কপালক্রমে অনেক ধোঁয়ার পরে ভিজা-কাঠ যদি ধরিয়া থাকে, তবে তাহা পুড়িয়া ছাই হওয়ার পূর্ব্বে রান্না চড়াইতে হইবে; শুধুশুধু শূন্য চুলায় আগুনে খোঁচার উপর খোঁচা দিতে থাকিলে আমোদ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ছাই হওয়ার কালটাও

* গতবর্ষের জ্যৈষ্ঠমাসের বঙ্গদর্শনে বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব উপলক্ষ্যে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কোনো কোনো অংশ বর্তমান প্রবন্ধে পুনরুক্ত হইয়াছে।

নিকটে অগ্রসর হয় এবং অন্নের আশা সুদূরবর্ত্তী হইতে থাকে।

বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রস্তাবে যখন সমস্ত দেশের লোকের ভাবনাকে একসঙ্গে জাগাইয়া তুলিয়াছে, তখন কেবলমাত্র সাময়িক উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত না হইয়া কতকগুলি গোড়াকার কথা স্পষ্টরূপে ভাবিয়া লইতে হইবে।

প্রথম কথা এই যে, আমরা স্বদেশের হিতসাধনসম্বন্ধে নিজের কাছে যে সকল আশা করি না, পরের কাছ হইতে সেই সকল আশা করিতেছিলাম। এমন অবস্থায় নিরাশ হওয়াই স্বাভাবিক এবং তাহাই মঙ্গলকর। নিরাশ হইবার মত আঘাত বারবার পাইয়াছি, কিন্তু চেতনা হয় নাই। এবারে ঈশ্বরের প্রসাদে আর একটা আঘাত পাইয়াছি, চেতনা হইয়াছে কি না, তাহার প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে।

"আমাদিগকে তোমরা সম্মান দাও, তোমরা শক্তি দাও, তোমরা নিজের সমান অধিকার দাও"—এই যে সকল দাবী আমরা বিদেশী রাজার কাছে নিঃসঙ্কোচে উপস্থিত করিয়াছি, ইহার মূলে একটা বিশ্বাস আমাদের মনে ছিল। আমরা কেতাব পড়িয়া নিশ্চয় স্থির করিয়াছিলাম যে, মানুষমাত্রেরই অধিকার সমান, এই সাম্যনীতি আমাদের রাজার জাতির।

কিন্তু সাম্যনীতি সেইখানেই খাটে, যেখানে সাম্য আছে। যেখানে আমারও শক্তি আছে, তোমার শক্তি সেখানে সাম্যনীতি অবলম্বন করে। য়ুরোপীয়ের প্রতি য়ুরোপীয়ের মনোহর সাম্যনীতি দেখিতে পাই, তাহা দেখিয়া আশান্বিত হইয়া উঠা অক্ষমের লুব্ধতামাত্র। অশক্তের প্রতি শক্ত যদি সাম্যনীতি অবলম্বন করে, তবে সেই প্রশ্রয় কি অশক্তের পক্ষে কোনোমতে শ্রেয়স্কর হইতে পারে? সে প্রশ্রয় কি অশক্তের পক্ষে সম্মানকর? অতএব সাম্যের দরবার করিবার পূর্ব্বে সাম্যের চেষ্টা করাই মনুষ্যমাত্রের কর্ত্তব্য। তাহার অন্যথা করা কাপুরুষতা।

ইহা আমরা স্পষ্টই দেখিয়াছি, যে সকল জাতি ইংরেজের সঙ্গে বর্ণে, ধর্ম্মে, প্রথায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহাদিগকে ইহারা নিজের পার্শ্বে স্বচ্ছন্দবিহারের স্থান দিয়াছেন, এমন ইহাদের ইতিহাসে কোথাও নাই। এমন কি, তাহারা ইহাদের সংঘর্ষে লোপ পাইয়াছে ও পাইতেছে, এমন প্রমাণ যথেষ্ট আছে। একবার চিন্তা করিয়া দেখ, ভারতবর্ষের রাজাদের যখন স্বাধীন ক্ষমতা ছিল, তখন তাঁহারা বিদেশের অপরিচিত লোকগুলীকে স্বরাজ্যে বসবাসের কিরূপ স্বচ্ছন্দ অধিকার দিয়াছিলেন—তাহার প্রমাণ এই পার্শিজাতি। ইহারা গোহত্যা প্রভৃতি দুইএকটি বিষয়ে হিন্দুদের বিধিনিষেধ মানিয়া, নিজের ধর্ম্ম, সমাজ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, নিজের স্বাতন্ত্র্য কোনো অংশে বিসর্জ্জন না দিয়া হিন্দুদের অতিথিরূপে প্রতিবেশিরূপে প্রভূত উন্নতিলাভ করিয়া আসিয়াছে, রাজা বা জনসমাজের হস্তে পরাজিত বলিয়া উৎপীড়ন সহ্য করে নাই। ইহার সহিত ইংরেজ-উপনিবেশগুলির ব্যবহার তুলনা করিয়া দেখিলে পূর্ব্বদেশের এবং পশ্চিমদেশের সাম্যবাদের প্রভেদটা আলোচনা করিবার সুযোগ হইবে।

সম্প্রতি দক্ষিণ-আফ্রিকায় বিলাতী উপনিবেশীদের একটি সভা বসিয়াছিল, তাহার বিবরণ হয় ত অনেকে ষ্টেট্স্ম্যান্‌পত্রে পড়িয়া থাকিবেন। তাঁহারা একবাক্যে সকলে স্থির

করিয়াছেন যে, এশিয়ার লোকদিগকে তাঁহারা কোনো প্রকারেই আশ্রয় দিবেন না। ব্যবসায় অথবা বাসের জন্য তাহাদিগকে ঘরভাড়া দেওয়া হইবে না, যদি কেহ দেয়, তাহার প্রতি বিশেষরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে যে সকল বাড়ী এশিয়ার লোকদিগকে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই তাহা ছাড়াইয়া লওয়া হইবে। যে সকল হৌস্ ঐশিয়দিগকে কোনো প্রকারে সাহায্য করে, খুচরা ব্যবসায়ী ও পাইকেরগণ যাহাতে তাহাদের সঙ্গে ব্যবসা বন্ধ করে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে এই নিয়মগুলি পালিত হয় এবং যাহাতে সভ্যগণ ঐশিয় দোকানদার বা মহাজনদের কাছ হইতে কিছু না কেনে বা তাহাদিগকে কোনোপ্রকার সাহায্য না করে, সেজন্য একটা Vigilance Association বা চৌকিদারদল বাঁধিতে হইবে। সভায় বক্তৃতাকালে একজন সভ্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, আমাদের সহরের মধ্যে ঐশিয় ব্যবসায়ীদিগকে যেমন করিয়া আড্ডা গাড়িতে দেওয়া হইয়াছে, এমন কি ইংলণ্ডের কোনো সহরে দেওয়া সম্ভব হইত? ইহার উত্তরে এক ব্যক্তি কহিল, না, সেখানে তাহাদিগকে "লিঞ্চ" করা হইত। শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলিয়াছিল, এখানেও কুলিদিগকে "লিঞ্চ" করাই শ্রেয়।

এশিয়ার প্রতি য়ুরোপের মনোভাবের এই যে সকল লক্ষণ দেখা যাইতেছে, ইহা লইয়া আমরা যেন অবোধের মত উত্তেজিত হইতে না থাকি। এগুলি স্তব্ধভাবে বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। যাহা স্বভাবতই ঘটিতেছে, যাহা বাস্তবিক সত্য, তাহা লইয়া রাগারাগি করিয়া কোনো ফল দেখি না। কিন্তু তাহার সঙ্গে যদি ঘর করিতে হয়, তবে প্রকৃত অবস্থাটা ভুল বুঝিলে কাজ চলিবে না। ইহা স্পষ্ট দেখা যায় যে, এশিয়াকে য়ুরোপ কেবলমাত্র পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান করে না, তাহাকে হেয় বলিয়াই জানে।

এ সম্বন্ধে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের একটা প্রভেদ আছে। আমরা যাহাকে হেয়জ্ঞানও করি, নিজের গণ্ডির মধ্যে তাহার যে গৌরব আছে, সেটুকু আমরা অস্বীকার করি না। সে তাহার নিজের মণ্ডলীতে স্বাধীন; তাহার ধর্ম্ম, তাহার আচার, তাহার বিধিব্যবস্থায় মধ্যে তাহার স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে; আমার মণ্ডলী আমার পক্ষে যেমন, তাহার মণ্ডলী তাহার পক্ষে ঠিক সেইরূপ,—এ কথা আমরা কখনো ভুলি না। এইজন্য যে সকল জাতিকে আমরা অনার্য্য বলিয়া ঘৃণাও করি, নিজের শ্রেষ্ঠতার অভিমানে আমরা তাহাদিগকে বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করি না। এই কারণে, আমাদের সমাজের মাঝখানেই হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল স্বস্থানে আপন প্রাধান্য রক্ষা করিয়াই চিরদিন বজায় আছে।

পশুদিগকে আমরা নিকৃষ্ট জীব বলিয়াই জানি, কিন্তু তবু বলিয়াছি—আমরাও আছি, তাহারাও থাক্; বলিয়াছি—প্রাণিহত্যা করিয়া আহার করাটা "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং, নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"—সেটা একটা প্রবৃত্তি, কিন্তু নিবৃত্তিটাই ভাল। য়ুরোপ বলে, জন্তুকে খাইবার অধিকার ঈশ্বর আমাদিগকে দান করিয়াছেন। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতার অভিমান ইতরকে যে কেবল ঘৃণা করে, তাহা নহে,

তাহাকে নষ্ট করিবার বেলা ঈশ্বরকে নিজের দলভুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতা নিজেকে জাহির করা এবং বজায় রাখাকেই চরম কর্ত্তব্য বলিয়া জানে। অন্যকে রক্ষা করা যদি তাহার সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ্ খাইয়া যায়, তবেই অন্যের পক্ষে বাঁচোয়া, যে অংশে লেশমাত্র খাপ্ না খাইবে, সে অংশে দয়ামায়া-বাচবিচার নাই। হাতের কাছে ইহার যে দুইএকটা প্রমাণ আছে, তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

বাঙালি যে একদিন এমন জাহাজ তৈরি করিতে পারিত, যাহা দেখিয়া ইংরেজ ঈর্ষা অনুভব করিয়াছে, আজ বাঙালির ছেলে তাহা স্বপ্নেও জানে না। ইংরেজ যে কেমন করিয়া এই জাহাজনির্ম্মাণের বিদ্যা বিশেষ চেষ্টায় বাংলাদেশ হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে, তাহা শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের "দেশের কথা" নামক বইখানি পড়িলে সকলে জানিতে পারিবেন। একটা জাতিকে, যে-কোনো দিকেই হোক্, একেবারে অক্ষম পঙ্গু করিয়া দিতে এই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাবাদী কোনো সঙ্কোচ অনুভব করে নাই।

ইংরেজ আজ সমস্ত ভারতবর্ষকে বলপূর্ব্বক নিরস্ত্র করিয়া দিয়াছে, অথচ ইহার নিদারুণতা তাহারা অন্তরের মধ্যে একবার অনুভব করে নাই। ভারতবর্ষ একটি ছোট দেশ নহে, একটি মহাদেশবিশেষ। এই বৃহৎ দেশের সমস্ত অধিবাসীকে চিরদিনের জন্য পুরুষানুক্রমে অস্ত্রধারণে অনভ্যস্ত, আত্মরক্ষায় অসমর্থ করিয়া তোলা যে কত-বড় অধর্ম্ম, যাহারা এককালে মৃত্যুভয়হীন বীরজাতি ছিল, তাহাদিগকে সামান্য একটা হিংস্রপশুর নিকট শঙ্কিত নিরুপায় করিয়া রাখা যে কিরূপ বীভৎস অন্যায়, সে চিন্তা ইহাদিগকে কিছুমাত্র পীড়া দেয় না। এখানে ধর্ম্মের দোহাই একেবারেই নিষ্ফল—কারণ জগতে অ্যাংলো-স্যাক্সন্ জাতির মাহাত্ম্যকে বিস্তৃত ও সুরক্ষিত করাই ইহারা চরম ধর্ম্ম জানে, সেজন্য ভারতবাসীকে যদি অস্ত্রত্যাগ করিয়া এই পৃথিবীতলে চিরদিনের মত নির্জ্জীব নিঃসহায় পৌরুষবিহীন হইতে হয়, তবে সে পক্ষে তাহাদের কোনো দয়ামায়া নাই।

অ্যাংলোস্যাক্সন যে শক্তিকে সকলের চেয়ে পূজা করে, ভারতবর্ষ হইতে সেই শক্তিকে প্রত্যহ সে অপহরণ করিয়া এদেশকে উত্তরোত্তর নিজের কাছে অধিকতর হেয় করিয়া তুলিতেছে, আমাদিগকে ভীরু বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে—অথচ একবার চিন্তা করিয়া দেখে না, এই ভীরুতাকে জন্ম দিয়া তাহাদের দলবদ্ধ ভীরুতা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে।

অতএব অনেকদিন হইতে ইহা দেখা যাইতেছে যে, অ্যাংলোস্যাক্সন্-মহিমাকে সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব করিবার পক্ষে দূরতম ব্যাঘাতটি যদি আমাদের দেশের পক্ষে মহত্তম দুর্ম্মূল্য বস্তুও হয়, তবে তাহাকে দলিয়া সমভূম করিয়া দিতে ইহারা বিচারমাত্র করে না।

এই সত্যটি ক্রমে ক্রমে ভিতরে ভিতরে আমাদের কাছেও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আজ গবর্মেণ্টের প্রত্যেক নড়াচড়ায় আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে, তাঁহারা মুখের কথায় যতই আশ্বাস দিতেছেন, আমাদের সন্দেহ ততই বাড়িয়া উঠিতেছে।

কিন্তু আমাদের পক্ষে অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, আমাদের সন্দেহেরও অন্ত নাই, আমাদের

নির্ভরেরও সীমা নাই। বিশ্বাসও করিব না, প্রার্থনাও করিব। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, এমন করিয়া সময় নষ্ট করিতেছ কেন, তবে উত্তর পাইবে, এক দলের দয়া না যদি হয় ত আর এক দলের দয়া হইতে পারে, প্রাতঃকালে যদি অনুগ্রহ না পাওয়া যায় ত যথেষ্ট অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিলে সন্ধ্যাকালে অনুগ্রহ পাওয়া যাইতে পারে। রাজা ত আমাদের একটি নয়, এইজন্য বারবার সহস্রবার তাড়া খাইলেও আমাদের আশা কোনোক্রমেই মরিতে চায় না—এম্‌নি আমাদের মুস্কিল হইয়াছে।

কথাটা ঠিক। আমাদের একজন রাজা নহে। পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষের ভাগ্যে একটা অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিয়াছে। একটি বিদেশী জাতি আমাদের উপরে রাজত্ব করিতেছে,—একজন বিদেশী রাজা নহে। একটি দূরবর্ত্তী সমগ্র জাতির কর্তৃত্বভার আমাদিগকে বহন করিতে হইতেছে। ভিক্ষাবৃত্তির পক্ষে এই অবস্থাটাই কি এত অনুকূল? প্রবাদ আছে যে, ভাগের মা গঙ্গা পায় না, ভাগের কুপোষ্যটি কি মাছের মুড়া এবং দুধের সর পায়?

অবিশ্বাস করিবার একটা শক্তি মানুষের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। ইহা কেবল একটা নেতিভাবক গুণ নহে, ইহা কর্তৃভাবক। মনুষ্যত্বকে রক্ষা করিতে হইলে এই অবিশ্বাসের ক্ষমতাকে নিজের শক্তির দ্বারা খাড়া করিয়া রাখিতে হয়। যিনি বিজ্ঞানচর্চ্চায় প্রবৃত্ত, তাঁহাকে অনেক জনশ্রুতি, অনেক প্রমাণহীন প্রচলিত ধারণাকে অবিশ্বাসের জোরে খেদাইয়া রাখিতে হয়, নহিলে তাঁহার বিজ্ঞান পণ্ড হইয়া যায়। যিনি কর্ম্ম করিতে চান, অবিশ্বাসের নিড়ানির দ্বারা তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্র নিষ্কণ্টক রাখিতে হয়। এই যে অবিশ্বাস, ইহা অন্যের উপরে অবজ্ঞা বা ঈর্ষাবশত নহে, নিজের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি, নিজের কর্ত্তব্যসাধনার প্রতি সম্মানবশত।

আমাদের দেশে ইংরেজ-রাজনীতিতে অবিশ্বাস যে কিরূপ প্রবল সতর্কতার সঙ্গে কাজ করিতেছে এবং সেই অবিশ্বাস যে কিরূপ নির্ম্মমভাবে আপনার লক্ষ্যসাধন করিতেছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উচ্চ ধর্ম্মনীতির নহে, কিন্তু সাধারণ রাজনীতির দিক্ দিয়া দেখিলে এই কঠিন অটল অবিশ্বাসের জন্য ইংরেজকে দোষ দেওয়া যায় না। ঐক্যের যে কি শক্তি, কি মাহাত্ম্য, তাহা ইংরেজ আমাদের চেয়ে ভাল করিয়াই জানে। ইংরেজ জানে, ঐক্যের অনুভূতির মধ্যে কেবল একটা শক্তিমাত্র নহে, পরন্তু এমন একটা আনন্দ আছে যে, সেই অনুভূতির আবেগে মানুষ সমস্ত দুঃখ ও ক্ষতি তুচ্ছ করিয়া অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। ইংরেজ আমাদের চেয়ে ভাল করিয়াই জানে যে, ক্ষমতা-অনুভূতির স্ফূর্ত্তি মানুষকে কিরূপ একটা প্রেরণা দান করে। উচ্চ অধিকার লাভ করিয়া রক্ষা করিতে পারিলে সেইখানেই তাহা আমাদিগকে থাকিতে দেয় না—উচ্চতর অধিকারলাভের জন্য আমাদের সমস্ত প্রকৃতি উন্মুখ হইয়া উঠে। আমাদের শক্তি নাই, আমরা পারি না, এই মোহই সকলের চেয়ে ভয়ঙ্কর মোহ। যে ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রয়োগের অধিকার পায় নাই, সে আপনার শক্তির স্বাদ জানে না; সে নিজেই নিজের পরম শত্রু। সে জানে যে, আমি অক্ষম, এবং এইরূপ জানাই তাহার দারুণ দুর্ব্বলতার

কারণ। এরূপ অবস্থায় ইংরেজ যে আমাদের মধ্যে ঐক্যবন্ধনে পোলিটিকাল্-হিসাবে আনন্দবোধ করিবে না, আমাদের হাতে উচ্চ অধিকার দিয়া আমাদের ক্ষমতার অনুভূতিকে উত্তরোত্তর সবল করিয়া তুলিবার জন্ত আগ্রহ অনুভব করিবে না, এ কথা বুঝিতে অধিক মননশক্তির প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে যে সকল পোলিটিকাল্ প্রার্থনাসভা স্থাপিত হইয়াছে, তাহারা যদি ভিক্ষুকের রীতিতেই ভিক্ষা করিত, তাহা হইলেও হয় ত মাঝে মাঝে দরখাস্ত মঞ্জুর হইত—কিন্তু তাহারা গর্জ্জন করিয়া ভিক্ষা করে, তাহারা দেশবিদেশের লোক একত্র করিয়া ভিক্ষা করে, তাহারা ভিক্ষাবৃত্তিকে একটা শক্তি করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে, সুতরাং এই শক্তিকে প্রশ্রয় দিতে ইংরেজ রাজা সাহস করে না। ইহার প্রার্থনা পূরণ করিলেই ইহার শক্তির স্পর্দ্ধাকে লালন করা হয়—এইজন্ত ইংরেজ-রাজনীতি আড়ম্বরসহকারে ইহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ইহার গর্ব্বকে খর্ব্ব করিয়া রাখিতে চান। এমন অবস্থায় এই সকল পোলিটিকাল্ সভা কৃতকার্য্যতার বল লাভ করিতে পারে না;—একত্র হইবার যে শক্তি, তাহা ক্ষণকালের জন্ত পায় বটে, কিন্তু সেই শক্তিকে একটা যথার্থ সার্থকতার দিকে প্রয়োগ করিবার যে স্ফূর্ত্তি, তাহা পায় না। সুতরাং নিষ্ফল চেষ্টায় প্রবৃত্ত শক্তি ভিন্ন হইতে অকালে জাত অরুণের মত পঙ্গু হইয়াই থাকে—সে কেবল পরের রথেই জোড়া থাকিবার উমেদার হইয়া থাকে, তাহার নিজের উড়িবার কোনো উদ্যম থাকে না।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ভারতবর্ষের পলিটিক্সে অবিশ্বাসনীতি রাজার তরফে অত্যন্ত সুদৃঢ়, অথচ আমাদের তরফে তাহা একান্ত শিথিল। আমরা একই কালে অবিশ্বাস প্রকাশ করি, কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধন ছেদন করি না। ইহাকেই বলে ওরিয়েন্টাল্—এইখানেই পাশ্চাত্যদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ। য়ুরোপ কায়মনোবাক্যে অবিশ্বাস করিতে জানে—আর, ষোলো-আনা অবিশ্বাসকে জাগাইয়া রাখিবার যে কঠিন শক্তি, তাহা আমাদের নাই—আমরা ভুলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাই, আমরা কোনোক্রমে বিশ্বাস করিতে পারিলে বাঁচি। যাহা অনাবশ্যক তাহাকেও রক্ষা করিবার, যাহা অশ্রদ্ধেয় তাহাকেও গ্রহণ করিবার, যাহা প্রতিকূল তাহাকেও অঙ্গীভূত করিবার জন্ত আমরা চিরদিন প্রস্তুত হইয়া আছি।

য়ুরোপ যাহা-কিছু পাইয়াছে, তাহা বিরোধ করিয়াই পাইয়াছে, আমাদের যাহা-কিছু সম্পত্তি, তাহা বিশ্বাসের ধন। এখন বিরোধপরায়ণ জাতির সহিত বিশ্বাসপরায়ণ জাতির বোঝাপড়া মুস্কিল হইয়াছে। স্বভাববিদ্রোহী স্বভাববিশ্বাসীকে শ্রদ্ধাই করে না।

যাহাই হউক, চিরন্তন প্রকৃতিবশত আমাদের ব্যবহারে যাহাই প্রকাশ পাউক, ইংরেজ রাজা স্বভাবতই যে আমাদের ঐক্যের সহায় নহেন, আমাদের ক্ষমতালাভের অনুকূল নহেন, এ কথা আমাদের মনকে অধিকার করিয়াছে। সেইজন্তই য়ুনিভার্সিটি-সংশোধন, বঙ্গব্যবচ্ছেদ প্রভৃতি গবর্মেন্টের ব্যবস্থাগুলিকে আমাদের শক্তি খর্ব্ব করিবার সঙ্কল্প বলিয়া কল্পনা করিয়াছি।

এমনতর সঙ্কিগ্ধ অবস্থার স্বাভাবিক গতি হওয়া উচিত—আমাদের স্বদেশহিতকর সমস্ত চেষ্টাকে নিজের দিকে ফিরাইয়া আনা। আমাদের অবিশ্বাসের মধ্যে এইটুকুই আমাদের লাভের বিষয়। পরের নিকট আমাদের সমস্ত প্রত্যাশাকে বদ্ধ করিয়া রাখিলে কেবল যে ফল পাওয়া যায় না, তাহা নহে, তাহাতে আমাদের ঈশ্বরপ্রদত্ত আত্মশক্তির মাহাত্ম্য চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। এইটেই আমাদিগকে বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। ইংরেজ আমাদের প্রার্থনাপূরণ করিবে না, অতএব আমরা তাহাদের কাছে যাইব না, এ সুবুদ্ধিটা লজ্জাকর। বস্তুত এই কথাই আমাদের মনে রাখিতে হইবে—অধিকাংশস্থলেই প্রার্থনাপূরণটাই আমাদের লোকসান। নিজের চেষ্টার দ্বারা যতটুকু ফল পাই, তাহাতে ফলও পাওয়া যায়, শক্তিও পাওয়া যায়, সোনাও পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে পরেশপাথরও পাওয়া যায়। পরের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই ভিক্ষাবৃত্তি হইতে যদি নিরস্ত হইতে হয়, পৌরুষবশত, মনুষ্যত্ববশত, নিজের প্রতি, নিজের অন্তর্যামী পুরুষের প্রতি সম্মানবশত যদি না হয়, তবে এই ভিক্ষাবৈরাগ্যের প্রতি আমি কোনো ভরসা রাখি না।

বস্তুত ইংরেজের উপরে রাগ করিয়া নিজের দেশের উপর হঠাৎ অত্যন্ত মনোযোগ দিতে আরম্ভ করা কেমন—যেমন স্বামীর উপরে অভিমান করিয়া সবেগে বাপের বাড়ী যাওয়া। সে বেগের হ্রাস হইতে বেশিক্ষণ লাগে না, আবার দ্বিগুণ আগ্রহে সেই শ্বশুরবাড়ীতেই ফিরিতে হয়। দেশের প্রতি আমাদের যে সকল কর্ত্তব্য আজ আমরা স্থির করিয়াছি, সে যদি দেশের প্রতি প্রীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই তাহার গৌরব এবং স্থায়িত্ব, ইংরেজের প্রতি রাগের উপরে যদি তাহার নির্ভর হয়, তবে তাহার উপরে ভরসা রাখা বড় কঠিন। ডাক্তার অসম্ভব ভিজিট্ বাড়াইয়াছে বলিয়া তাহার উপরে রাগ করিয়া যদি শরীর ভালো করিতে চেষ্টা করি, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু শরীরের প্রতি মমতা করিয়া যদি এ কাজে প্রবৃত্ত হই, তবেই কাজটা যথার্থভাবে সম্পন্ন হইবার এবং উৎসাহ স্থায়িভাবে রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

তবে কিনা, যেমন ঘড়ির কল কোনো একটা আকস্মিক বাধায় বন্ধ হইয়া থাকিলে তাহাকে প্রথমে একটা নাড়া দেওয়া যায়, তাহার পরেই সে আর দ্বিতীয় ঝাঁকানির অপেক্ষা না করিয়া নিজের দমেই নিজে চলিতে থাকে—তেমনি স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্যপরতাও হয় ত আমাদের সমাজে একটা বড়রকমের ঝাঁকানির অপেক্ষায় ছিল—হয় ত স্বদেশের প্রতি স্বভাবসিদ্ধ প্রীতি এই ঝাঁকানির পর হইতে নিজের আভ্যন্তরিক শক্তিতেই আবার কিছুকাল সহজে চলিতে থাকিবে। অতএব এই ঝাঁকানিটা যাহাতে আমাদের মনের উপরে বেশ রীতিমত লাগে, সে পক্ষেও আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। যদি সাময়িক আন্দোলনের সাহায্যে আমাদের নিত্য জীবনী ক্রিয়া সজাগ হইয়া উঠে, তবে এই সুযোগটা ছাড়িয়া দেওয়া কিছু নয়।

এখন তবে কথা এই যে, আমাদের দেশে বঙ্গব্যবচ্ছেদের আক্ষেপে আমরা যথাসম্ভব বিলাতী জিনিষ কেনা বন্ধ করিয়া দেশী

জিনিষ কিনিবার জন্য যে সঙ্কল্প করিয়াছি, সেই সঙ্কল্পটিকে স্তব্ধভাবে, গভীরভাবে স্থায়ী মঙ্গলের উপরে স্থাপিত করিতে হইবে। আমি আমাদের এই বর্ত্তমান উদ্যোগটির সম্বন্ধে যদি আনন্দ অনুভব করি, তবে তাহার কারণ এ নয় যে, তাহাতে ইংরেজের ক্ষতি হইবে, তাহার কারণ সম্পূর্ণভাবে এও নহে যে, তাহাতে আমাদের দেশী ব্যবসায়ীদের লাভ হইবে—এ সমস্ত লাভক্ষতি নানা বাহিরের অবস্থার উপরে নির্ভর করে—সে সমস্ত সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখা আমার ক্ষমতায় নাই। আমি আমাদের অন্তরের লাভের দিক্‌টা দেখিতেছি। আমি দেখিতেছি, আমরা যদি সর্ব্বদা সচেষ্ট হইয়া দেশীজিনিষ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হই, যে জিনিষটা দেশী নহে, তাহার ব্যবহারে বাধা হইতে হইলে যদি কষ্ট অনুভব করিতে থাকি, দেশীজিনিষ-ব্যবহারের গতিকে যদি কতকটা পরিমাণে আরাম ও আড়ম্বর হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, যদি সে-জন্য মাঝে মাঝে স্বদলের উপহাস ও নিন্দা সহ্য করিতে প্রস্তুত হই, তবে স্বদেশ আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিতে পারিবে। এই উপলক্ষ্যে আমাদের চিত্ত সর্ব্বদা স্বদেশের অভিমুখ হইয়া থাকিবে। আমরা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখস্বীকারের দ্বারা আপন দেশকে যথার্থভাবে আপনার করিয়া লইব। আমাদের আরাম, বিলাস, আত্মসুখতৃপ্তি আমাদিগকে প্রত্যহ স্বদেশ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছিল, প্রত্যহ আমাদিগকে পরবশ করিয়া লোকহিতব্রতের জন্য অক্ষম করিতেছিল—আজ আমরা সকলে মিলিয়া যদি নিজের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় দেশের দিকে তাকাইয়া ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর ও আরামের অভ্যাস কিছুপরিমাণও পরিত্যাগ করিতে পারি, তবে সেই ত্যাগের ঐক্যদ্বারা আমরা পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেশকে বলিষ্ঠ করিতে পারিব। দেশীজিনিষ ব্যবহার করার ইহাই যথার্থ সার্থকতা—ইহা দেশের পূজা, ইহা একটি মহান্ সঙ্কল্পের নিকটে আত্মনিবেদন।

এইরূপে কোনো একটা কর্ম্মের দ্বারা, কাঠিন্যের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা আত্মনিবেদনের জন্য আমাদের অন্তঃকরণ নিশ্চয়ই অপেক্ষা করিয়া আছে—আমরা কেবলমাত্র সভা ডাকিয়া, কথা কহিয়া, আবেদন করিয়া নিশ্চয়ই তৃপ্তিলাভ করি নাই। কখনো ভ্রমেও মনে করি নাই, ইহার দ্বারাই আমাদের জীবন সার্থক হইতেছে—ইহার দ্বারা আমরা নিজের একটা শক্তি উপলব্ধি করিতে পারি নাই—ইহা আমাদের চিত্তকে, আমাদের পূজার ব্যগ্রতাকে, আমাদের সুখদুঃখনিরপেক্ষ, ফলাফলবিচারবিহীন আত্মদানের ব্যাকুলতাকে দুর্নিবারবেগে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারে নাই। কি আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তির প্রকৃতিতে, কি জাতির প্রকৃতিতে কোনো একটি মহা-আহ্বানে আপনাকে নিঃশেষে বাহিরে নিবেদন করিবার জন্য প্রতীক্ষা অন্তরের অন্তরে বাস করিতেছে—সেখানে আমাদের দৃষ্টি পড়ে বা না পড়ে, তাহার নির্ব্বাণহীন প্রদীপ জ্বলিতেছেই। যখন কোনো বৃহৎ আকর্ষণে আমরা আপনাদের আরামের, আপনাদের স্বার্থের গহ্বর ছাড়িয়া আপনাকে যেন আপনার বাহিরে প্রবলভাবে সমর্পণ করিতে পারি, তখন আমাদের ভয় থাকে না, দ্বিধা থাকে না,

তখনি আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত অদ্ভুত শক্তিকে উপলব্ধি করিতে পারি—নিজেকে আর দীনহীন দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয় না। এইরূপে নিজের অন্তরের শক্তিকে এবং সেই শক্তির যোগে বৃহৎ বাহিরের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করাই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের এবং জাতিগত সত্তার একমাত্র চরিতার্থতা।

নিশ্চয় জানি, এই বিপুল সার্থকতার জন্য আমরা সকলেই অপেক্ষা করিয়া আছি। ইহারই অভাবে আজ আমাদের সমস্ত দেশকে বিষাদে আচ্ছন্ন ও অবসাদে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। ইহারই অভাবে আমাদের মজ্জাগত দৌর্ব্বল্য যায় না, আমাদের পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য ঘোচে না, আমাদের আত্মাভিমানের চপলতা কিছুতেই দূর হয় না। ইহারই অভাবে আমরা দুঃখবহন করিতে, বিলাসত্যাগ করিতে, ক্ষতিস্বীকার করিতে অসম্মত। ইহারই অভাবে আমরা প্রাণটাকে ভয়মুগ্ধ শিশুর ধাত্রীর মত একান্ত আগ্রহে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছি, মৃত্যুকে নিঃশঙ্ক বীর্য্যের সহিত বরণ করিতে পারিতেছি না। যিনি আমাদের দেশের দেবতা, যিনি আমাদের পিতামহদের সহিত আমাদিগকে একসূত্রে বাঁধিয়াছেন, যিনি আমাদের সন্তানের মধ্যে আমাদের সাধনাকে সিদ্ধিদান করিবার পথ মুক্ত করিতেছেন, যিনি আমাদের এই সূর্য্যালোকদীপ্ত নীলাকাশের নিম্নে যুগে যুগে সকলকে একত্র করিয়া এক বিশেষ বাণীর দ্বারা আমাদের সকলের চিত্তকে এক বিশেষভাবে উদ্বোধিত করিতেছেন—আমাদের চিরপরিচিত ছায়ালোকবিচিত্র অরণ্য-প্রান্তর-শস্যক্ষেত্র যাঁহার বিশেষ মূর্ত্তিকে পুরুষানুক্রমে আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রকাশমান করিয়া রাখিয়াছে—আমাদের পুণ্য-নদীসকল যাঁহার পাদোদকরূপে আমাদের গৃহের দ্বারে দ্বারে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, যিনি জাতিনির্ব্বিশেষে হিন্দুমুসলমানখৃষ্টানকে এক মহাযজ্ঞে আহ্বান করিয়া পাশে পাশে বসাইয়া সকলেরই অন্নের থালায় স্বহস্তে পরিবেষণ করিয়া আসিতেছেন, দেশের অন্তর্যামী সেই দেবতাকে, আমাদের সেই চিরন্তন অধিপতিকে এখনো আমরা সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই। যদি অকস্মাৎ কোনো বৃহৎ ঘটনায়, কোনো মহান্ আবেগের ঝড়ে পর্দ্দা একবার একটু উড়িয়া যায়, তবে এই দেবাধিষ্ঠিত দেশের মধ্যে হঠাৎ দেখিতে পাইব, আমরা কেহই স্বতন্ত্র নহি, বিচ্ছিন্ন নহি—দেখিতে পাইব, যিনি যুগযুগান্তর হইতে আমাদিগকে এই সমুদ্রবিধৌত হিমাদ্রি-অধিরাজিত উদার দেশের মধ্যে এক ধনধান্য, এক সুখদুঃখ, এক বিরাট্ প্রকৃতির মাঝখানে রাখিয়া নিরন্তর এক করিয়া তুলিতেছেন, সেই দেশের দেবতা দুর্জ্জেয়, তাঁহাকে কোনোদিন কেহই অধীন করে নাই, তিনি ইংরেজীস্কুলের ছাত্র নহেন, তিনি ইংরেজ রাজার প্রজা নহেন, আমাদের বহুতর দুর্গতি তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই, তিনি প্রবল, তিনি চিরজাগ্রত, ইঁহার এই সহজমুক্ত স্বরূপ দেখিতে পাইলে তখনই আনন্দের প্রাচুর্য্যবেগে আমরা অনায়াসেই পূজা করিব, ত্যাগ করিব, আত্মসমর্পণ করিব, কোন উপদেশের অপেক্ষা থাকিবে না। তখন দুর্গম পথকে পরিহার করিব না, তখন পরের প্রসাদকেই জাতীয় উন্নতিলাভের চরম সম্বল মনে করাকে পরিহাস করিব এবং

অপমানের মূল্যে আশু ফললাভের উঞ্ছবৃত্তিকে অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করিতে পারিব।

আজ একটি আকস্মিক ঘটনায় সমস্ত বাঙালিকে একই বেদনায় আঘাত করাতে আমরা যেন ক্ষণকালের জন্যও আমাদের এই স্বদেশের অন্তর্যামী দেবতার আভাস পাইয়াছি। সেইজন্য যাহারা কোনোদিন চিন্তা করিত না, তাহারা চিন্তা করিতেছে; যাহারা পরিহাস করিত, তাহারা স্তব্ধ হইয়াছে; যাহারা কোনো মহান্ সঙ্কল্পের দিকে তাকাইয়া কোনোরূপ ত্যাগস্বীকার করিতে জানিত না, তাহারাও যেন কিছু অসুবিধা ভোগ করিবার জন্য উদ্যম অনুভব করিতেছে এবং যাহারা প্রত্যেক কথাতেই পরের দ্বারে ছুটিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিত, তাহারাও আজ কিঞ্চিৎ দ্বিধার সহিত নিজের শক্তি সন্ধান করিতেছে।

একবার এই আশ্চর্য্য ব্যাপারটা ভাল করিয়া মনের মধ্যে অনুভব করিয়া দেখুন। ইতিপূর্ব্বে রাজার কোনো অপ্রিয় ব্যবহারে বা কোনো অনভিমত আইনে আঘাত পাইয়া আমরা অনেকবার অনেক কণ্ঠকৌশল, অনেক কোলাহল, অনেক সভা আহ্বান করিয়াছি, কিন্তু আমাদের অন্তঃকরণ বল পায় নাই, আমরা নিজের চেষ্টাকে নিজে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি নাই, এইজন্য সহস্র অত্যুক্তিদ্বারাও রাজার প্রত্যয় আকর্ষণ করিতে পারি নাই, দেশেরও ঔদাসীন্য দূর করিতে পারি নাই। আজ আসন্ন বঙ্গবিভাগের উদ্যোগ বাঙালির পক্ষে পরম শোকের কারণ হইলেও এই শোক আমাদিগকে নিরুপায় অবসাদে অভিভূত করে নাই। বস্তুত বেদনার মধ্যে আমরা একটা আনন্দই অনুভব করিতেছি। আনন্দের কারণ, এই বেদনার মধ্যে আমরা নিজেকে অনুভব করিতেছি,— পরকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি না। আনন্দের কারণ, আমরা আভাস পাইয়াছি আমাদের নিজের একটা শক্তি আছে, সেই শক্তির প্রভাবে আজ আমরা ত্যাগ করিবার, দুঃখভোগ করিবার পরম অধিকার লাভ করিয়াছি। আজ আমাদের বালকেরাও বলিতেছে—পরিত্যাগ কর, বিদেশের বেশভূষা, বিদেশের বিলাস পরিহার কর—সে কথা শুনিয়া বৃদ্ধেরাও তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিতেছে না, বিজ্ঞেরাও তাহাদিগকে পরিহাস করিতেছে না;—এই কথা নিঃসঙ্কোচে বলিবার এবং এই কথা নিস্তব্ধ হইয়া শুনিবার বল আমরা কোথা হইতে পাইলাম! সুখেই হউক্ আর দুঃখেই হউক্, সম্পদেই হউক আর বিপদেই হউক্, হৃদয়ে হৃদয়ে যথার্থভাবে মিলন হইলেই যাঁহার আবির্ভাব আর মুহূর্ত্তকাল গোপন থাকে না, তিনি আমাদিগকে বিপদের দিনে এই বল দিয়াছেন,—দুঃখের দিনে এই আনন্দ দিয়াছেন। আজ দুর্যোগের রাত্রে যে বিদ্যুতের আলোক চকিত হইতেছে, সেই আলোকে যদি আমরা রাজপ্রাসাদের সচিবদেরই মুখমণ্ডল দেখিতে থাকিতাম তবে আমাদের অন্তরের এই উদার উদ্যমটুকু কখনই থাকিত না। এই আলোকে আমাদের দেবালয়ের দেবতাকে, আমাদের ঐক্যাধিষ্ঠাত্রী অভয়াকে দেখিতেছি—সেইজন্যই আজ আমাদের উৎসাহ এমন সজীব হইয়া উঠিল। সম্পদের দিন নহে, কিন্তু সঙ্কটের দিনেই বাংলাদেশ আপন হৃদয়ের মধ্যে এই প্রাণ লাভ করিল। ইহাতেই বুঝিতে হইবে, ঈশ্বরের

শক্তি যে কেবল সম্ভবের পথ দিয়াই কাজ করে, তাহা নহে; ইহাতেই বুঝিতে হইবে, দুর্ব্বলেরও বল আছে, দরিদ্রেরও সম্পদ্ আছে, এবং দুর্ভাগ্যকেই সৌভাগ্য করিয়া তুলিতে পারেন যিনি, সেই জাগ্রত পুরুষ, কেবল আমাদের জাগরণের প্রতীক্ষায় নিস্তব্ধ আছেন। তাঁহার অনুশাসন এ নয় যে, গবর্মেণ্ট তোমাদের মানচিত্রের মাঝখানে যে একটা কৃত্রিম রেখা টানিয়া দিতেছেন, তোমরা তাঁহাদিগকে বলিয়া-কহিয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়া, বিলাতি-জিনিষ-কেনা রহিত করিয়া, বিলাতে টেলিগ্রাম ও দূত পাঠাইয়া তাঁহাদের অনুগ্রহে সেই রেখা মুছিয়া লও। তাঁহার অনুশাসন এই যে, বাংলার মাঝখানে যে রাজাই যতগুলি রেখাই টানিয়া দিন্, তোমাদিগকে এক থাকিতে হইবে—আবেদন-নিবেদনের জোরে নয়, নিজের শক্তিতে এক থাকিতে হইবে, নিজের প্রেমে এক থাকিতে হইবে। রাজার দ্বারা বঙ্গবিভাগ ঘটিতেও পারে, না-ও ঘটিতে পারে—তাহাতে অতিমাত্র বিষণ্ণ বা উল্লসিত হইয়ো না—তোমরা যে আজ একই আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতেছ, ইহাতেই আনন্দিত হও এবং সেই আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির জন্য সকলের মনে একই উদ্যম জন্মিয়াছে, ইহার দ্বারাই সার্থকতা লাভ কর!

অতএব এখন কিছুদিনের জন্য কেবলমাত্র একটা হৃদয়েরই আন্দোলন ভোগ করিয়া এই শুভ সুযোগকে নষ্ট করিয়া ফেলিলে চলিবে না। আপনাকে সংবরণ করিয়া, সংযত করিয়া এই আবেগকে নিত্য করিতে হইবে। আমাদের যে ঐক্যকে একটা আঘাতের সাহায্যে দেশের আদ্যন্তমধ্যে আমরা একসঙ্গে সকলে অনুভব করিয়াছি,—আমরা হিন্দু-মুসলমান, ধনি-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রীলোক ও পুরুষ সকলেই বাঙালী বলিয়া যে এক বাংলার বেদনা অনুভব করিতে পারিয়াছি, আঘাতের কারণ দূর হইলেই বা বিস্মৃত হইলেই সেই ঐক্যের চেতনা যদি দূর হইয়া যায়, তবে আমাদের মত দুর্ভাগা আর কেহ নাই। এখন হইতে আমাদের ঐক্যকে নানা উপলক্ষ্যে নানা আকারে স্বীকার ও সম্মান করিতে হইবে। এখন হইতে আমরা হিন্দু ও মুসলমান, সহরবাসী ও পল্লিবাসী, পূর্ব্ব ও পশ্চিম, পরস্পরের দৃঢ়বদ্ধ করতলের বন্ধন প্রতিক্ষণে অনুভব করিতে থাকিব। বিচ্ছেদে প্রেমকে ঘনিষ্ঠ করে, বিচ্ছেদের ব্যবধানের মধ্য দিয়া যে প্রবল মিলন সজ্ঘটিত হইতে থাকে, তাহা সচেষ্ট, জাগ্রত, বৈদ্যুতশক্তিতে পরিপূর্ণ। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি আমাদের বঙ্গভূমি রাজকীয় ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নই হয়, তবে সেই বিচ্ছেদবেদনার উত্তেজনায় আমাদিগকে সামাজিক সদ্ভাবে আরো দৃঢ়রূপে মিলিত হইতে হইবে, আমাদিগকে নিজের চেষ্টায় ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে, সেই চেষ্টার উদ্রেকই আমাদের পরম লাভ।

কিন্তু অনির্দ্দিষ্টভাবে, সাধারণভাবে এ কথা বলিলে চলিবে না। মিলন কেমন করিয়া ঘটিতে পারে? একত্রে মিলিয়া কাজ করিলেই মলিন ঘটে, তাহা ছাড়া যথার্থ মিলনের আর কোনো উপায় নাই।

দেশের কার্য্য বলিতে আর ভুল বুঝিলে চলিবে না—এখন সে দিন নাই,—আমি যাহা বলিতেছি, তাহার অর্থ এই, সাধ্যমত নিজেদের অভাবমোচন করা, নিজেদের কর্ত্তব্য নিজে সাধন করা।

এই অভিপ্রায়টি মনে রাখিয়া দেশের কর্ম্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্ত্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভার অধিনায়ক করিব—তাঁহাদের নিকটে নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া রাখিব—তাঁহাদিগকে কর দান করিব, তাঁহাদের আদেশ পালন করিব, নির্ব্বিচারে তাঁহাদের শাসন মানিয়া চলিব—তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া আমাদের দেশকে সম্মানিত করিব।

আমি জানি, আমার এই প্রস্তাবকে আমাদের বিবেচক ব্যক্তিগণ অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। যাহা নিতান্তই সহজ, যাহাতে দুঃখ নাই, ত্যাগ নাই, অথচ আড়ম্বর আছে, উদ্দীপনা আছে, তাহা ছাড়া আর কিছুকেই আমাদের স্বাদেশিকগণ সাধ্য বলিয়া গণ্যই করেন না। কিন্তু সম্প্রতি নাকি বাংলায় একটা দেশব্যাপী ক্ষোভ জন্মিয়াছে, সেইজন্যই আমি বিরক্তি ও বিদ্রূপ উদ্রেকের আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রস্তাবটি সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি এবং সকলকে আশ্বস্ত করিবার জন্য একটা ঐতিহাসিক নজিরও এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। আমি যে বিবরণটি পাঠ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা রুশীয় গবর্মেণ্টের অধীনস্থ বাহ্লীকপ্রদেশীয়। ইহা কিছুকাল পূর্ব্বে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্‌পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই বাহ্লীকপ্রদেশে জর্জ্জীয় ও আর্ম্মাণিগণ যে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা যে কেন আমাদের পক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে না, তাহা জানি না। সেখানে "সকারটুভেলিষ্ট"নামধারী একটি জর্জ্জীয় "ন্যাশনালিষ্ট"সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে—ইহারা "কার্স"প্রদেশে প্রত্যেক গ্রাম্যজিলায় স্বদেশীয় বিচারকদের দ্বারা গোপনবিচারশালা স্থাপন করিয়া রাজকীয় বিচারালয়কে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছেন।

The peasants aver that these secret courts work with much greater expedition, accuracy and fairness than the Crown Courts, and that the Judges have the invaluable characteristic of incorruptibility. The Drozhakisti, or Armenian Nationalist party, had previously established a similar system of justice in the rural districts of the province of Erwan and more than that, they had practically supplanted the whole of the Government system of rural administration and were employing agricultural experts, teachers and physicians of their own choosing. It has long been a matter of notoriety that ever since the suppression of Armenian schools by the Russian minister of Education Delyanoff, who by the way, was himself an Armenian, the Armenian population of the Caucasus has maintained clandestine national schools of its own.

আমি কেবল এই বৃত্তান্তটি উদাহরণস্বরূপে উদ্ধৃত করিয়াছি—অর্থাৎ ইহার মধ্যে এইটুকুই দ্রষ্টব্য যে, স্বদেশের কর্ম্মভার দেশের লোকের নিজেদের গ্রহণ করিবার চেষ্টা একটা পাগ্‌লামী নহে—বস্তুত দেশের হিতেচ্ছু ব্যক্তিদের এইরূপ চেষ্টাই একমাত্র স্বাভাবিক।

আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত-

লোক যে গবর্মেণ্টের চাকরীতে মাথা বিকাইয়া রাখিয়াছেন, ইহার শোচনীয়তা কি আমরা চিন্তা করিব না, কেবল চাকরীর পথ আরো প্রশস্ত করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিব? চাকরীর খাতিরে আমাদের দুর্ব্বলতা কতদূর বাড়িতেছে, তাহা কি আমরা জানি না? আমরা মনিবকে খুসি করিবার জন্য গুপ্তচরের কাজ করিতেছি, মাতৃভূমির বিরুদ্ধে হাত তুলিতেছি এবং যে মনিব আমাদের প্রতি অশ্রদ্ধা করে, তাহার পৌরুষক্ষয়কর অপমানজনক আদেশও প্রফুল্লমুখে পালন করিতেছি—এই চাকরী আরো বিস্তার করিতে হইবে? দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের বন্ধনকে আরো দৃঢ় করিতে হইবে? আমরা যদি স্বদেশের কর্ম্মভার নিজে গ্রহণ করিতাম, তবে গবর্মেণ্টের আপিস রাক্ষসের মত আমাদের দেশের শিক্ষিত-লোকদিগকে কি এমন নিঃশেষে গ্রাস করিত? আবেদনের দ্বারা সরকারের চাকরী নহে, পৌরুষের দ্বারা স্বদেশের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তার করিতে হইবে! যাহাতে আমাদের ডাক্তার, আমাদের শিক্ষক, আমাদের এঞ্জিনিয়ারগণ দেশের অধীন থাকিয়া দেশের কাজেই আপনার যোগ্যতার স্ফূর্ত্তিসাধন করিতে পারেন, আমাদিগকে তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। নতুবা আমাদের যে কি শক্তি আছে, তাহার পরিচয়ই আমরা পাইব না। তা ছাড়া, এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, সেবার অভ্যাসের দ্বারাই প্রীতির উপচয় হয়; যদি আমরা শিক্ষিতগণ এমন কোথাও কাজ করিতাম, যেখানে দেশের কাজ করিতেছি, এই ধারণা সর্ব্বদা স্পষ্টরূপে জাগ্রত থাকিত, তবে দেশকে ভালবাস, এ কথা নীতিশাস্ত্রের সাহায্যে উপদেশ দিতে হইত না। তবে, একদিকে যোগ্যতার অভিমান করা, অন্যদিকে প্রত্যেক অভাবের জন্য পরের সাহায্যের প্রার্থী হওয়া—এমনতর অদ্ভুত অশ্রদ্ধাকর আচরণে আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইত না, দেশের শিক্ষা স্বাধীন হইত এবং শিক্ষিত-সমাজের শক্তি বন্ধনমুক্ত হইত।

জর্ম্মানগণ, আর্ম্মাণিগণ প্রবল জাতি নহে—ইহারা যে সকল কাজ প্রতিকূল অবস্থাতেও নিজে করিতেছে, আমরা কি সেই সকল কাজেরই জন্য দরবার করিতে দৌড়াই না? কৃষিতত্ত্ব-পারদর্শীদের লইয়া আমরাও কি আমাদের দেশের কৃষির উন্নতিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিতাম না? আমাদের ডাক্তার লইয়া আমাদের দেশের স্বাস্থ্যবিধানচেষ্টা কি আমাদের পক্ষে অসম্ভব? আমাদের পল্লির শিক্ষাভার কি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না? যাহাতে মামলায়-মকদ্দমায় লোকের চরিত্র ও সম্বল নষ্ট না হইয়া সহজ বিচারপ্রণালীতে সালিশ-নিষ্পত্তি দেশে চলে, তাহার ব্যবস্থা করা কি আমাদের সাধ্যাতীত? সমস্তই সম্ভব হয়, যদি আমাদের এই সকল স্বদেশী চেষ্টাকে যথার্থভাবে প্রয়োগ করিবার জন্য একটা দল বাঁধিতে পারি। এই দল, এই কর্তৃসভা আমাদিগকে স্থাপন করিতেই হইবে—নতুবা বলিব, আজ আমরা যে একটা উত্তেজনা প্রকাশ করিতেছি, তাহা মাদকতা-মাত্র, তাহার অবসানে অবসাদের পঙ্কশয্যায় লুণ্ঠন করিতে হইবে।

একটা কথা আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে যে, পরের প্রদত্ত অধিকার আমাদের জাতীয়সম্পদ্‌রূপে গণ্য হইতে

পারে না—বরঞ্চ তাহার বিপরীত! দৃষ্টান্ত-স্বরূপে একবার পঞ্চায়েৎবিধির কথা ভাবিয়া দেখুন। এক সময় পঞ্চায়েৎ আমাদের দেশের জিনিষ ছিল, এখন পঞ্চায়েৎ গবর্মেণ্টের আপিসে-গড়া জিনিষ হইতে চলিল। যদি ফল বিচার করা যায়, তবে এই দুই পঞ্চায়েতের প্রকৃতি একেবারে পরস্পরের বিপরীত বলিয়াই প্রতীত হইবে। যে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা গ্রামের লোকের স্বতঃপ্রদত্ত নহে, যাহা গবর্মেণ্টের দত্ত, তাহা বাহিরের জিনিষ হওয়াতেই গ্রামের বক্ষে একটা অশান্তির মত চাপিয়া বসিবে—তাহা ঈর্ষার সৃষ্টি করিবে—এই পঞ্চায়েৎপদ লাভ করিবার জন্য অযোগ্য লোকে এমন সকল চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে, যাহাতে বিরোধ জন্মিতে থাকিবে—পঞ্চায়েৎ ম্যাজিষ্ট্রেটবর্গকেই স্বপক্ষ এবং গ্রামকে অপরপক্ষ বলিয়া জানিবে, এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বাহবা পাইবার জন্য গোপনে অথবা প্রকাশ্যে গ্রামের বিশ্বাস ভঙ্গ করিবে—ইহারা গ্রামের লোক হইয়া গ্রামের চরের কাজ করিতে বাধ্য হইবে এবং যে পঞ্চায়েৎ এদেশে গ্রামের বলস্বরূপ ছিল, সেই পঞ্চায়েৎই গ্রামের দুর্ব্বলতার কারণ হইবে। ভারতবর্ষের যে সকল গ্রামে এখনো গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রভাব বর্ত্তমান আছে—যে পঞ্চায়েৎ কালক্রমে শিক্ষার বিস্তার ও অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে স্বভাবতই স্বাদেশিক পঞ্চায়েতে পরিণত হইতে পারিত—যে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎগণ একদিন স্বদেশের সাধারণকার্য্যে পরস্পরের মধ্যে যোগ বাঁধিয়া দাঁড়াইবে এমন আশা করা যাইত, সেই সকল গ্রামের পঞ্চায়েৎগণের মধ্যে একবার যদি গবর্মেণ্টের বেনো-জল প্রবেশ করে, তবে পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েতত্ব চিরদিনের মত ঘুচিল। দেশের জিনিষ হইয়া তাহারা যে কাজ করিত, গবর্মেণ্টের জিনিষ হইয়া তাহার সম্পূর্ণ উল্টারকম কাজ করিবে।

ইহা হইতে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, দেশের হাত হইতে আমরা যে ক্ষমতা পাই, তাহার প্রকৃতি একরকম, আর পরের হাত হইতে যাহা পাই, তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্য-রকম হইবেই। কারণ, মূল্য না দিয়া কোনো জিনিষ আমরা পাইতেই পারি না। সুতরাং দেশের কাছ হইতে আমরা যাহা পাইব, সে-জন্য দেশের কাছেই আপনাকে বিকাইতে হইবে—পরের কাছ হইতে যাহা পাইব, সেজন্য পরের কাছে না বিকাইয়া উপায় নাই। এইরূপ বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ যদি পরের কাছে মাগিয়া লইতে হয়, তবে শিক্ষাকে পরের গোলামি করিতেই হইবে—যাহা স্বাভাবিক, তাহার জন্য আমরা বৃথা চীৎকার করিয়া মরি কেন?

দৃষ্টান্তস্বরূপ আর একটা কথা বলি। মহাজনেরা চাষীদের অধিক সুদে কর্জ্জ দিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে, আমরা প্রার্থনা ছাড়া অন্য উপায় জানি না—অতএব গবর্মেণ্টকেই অথবা বিদেশী মহাজনদিগকে যদি আমরা বলি যে, তোমরা অল্পসুদে আমাদের গ্রামে গ্রামে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন কর, তবে নিজে ধর্ম্মের ডাকিয়া-আনিয়া আমাদের দেশের চাষীদিগকে নিঃশেষে পরের হাতে বিকাইয়া দেওয়া হয় না? যাহারা যথার্থই দেশের বল, দেশের সম্পদ্, তাহাদের প্রত্যেকটিকে কি পরের হাতে এমনি করিয়া বাঁধা রাখিতে হইবে? আমরা

যে পরিমাণেই দেশের কাজ পরকে দিয়া করাইব, সেই পরিমাণেই আমরা নিজের শক্তিকেই বিকাইতে থাকিব, দেশকে স্বেচ্ছাকৃত অধীনতাপাশে উত্তরোত্তর অধিকতর বাঁধিতে থাকিব, এ কথা কি বুঝা এতই কঠিন? পরের প্রদত্ত ক্ষমতা আমাদের পক্ষে উপস্থিত সুবিধার কারণ যেমনই হৌক, তাহা আমাদের পক্ষে ছদ্মবেশী অভিসম্পাত, এ কথা স্বীকার করিতে আমাদের যত বিলম্ব হইবে, আমাদের মোহজাল ততই দুশ্ছেদ্য হইয়া উঠিতে থাকিবে।

অতএব আর দ্বিধা না করিয়া আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য্য আমাদিগকে নিজের হাতে লইতেই হইবে। সরকারী পঞ্চায়েতের মুষ্টি আমাদের পল্লীর কণ্ঠে দৃঢ় হইবার পূর্ব্বেই আমাদের নিজের পল্লিপঞ্চায়েৎকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। চাষীকে আমরাই রক্ষা করিব, তাহার সন্তানদিগকে আমরাই শিক্ষা দিব, কৃষির উন্নতি আমরাই সাধন করিব, গ্রামের স্বাস্থ্য আমরাই বিধান করিব এবং সর্ব্বনেশে মামলার হাত হইতে আমাদের জমিদার ও প্রজাদিগকে আমরাই বাঁচাইব। এ সম্বন্ধে রাজার সাহায্য লইবার কল্পনাও যেন আমাদের মাথায় না আসে—কারণ, এস্থলে সাহায্য লইবার অর্থই দুর্ব্বলের স্বাধীন অধিকারের মধ্যে প্রবলকে ডাকিয়া আনিয়া বসানো।

একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, বিদেশী শাসনকালে বাংলাদেশে যদি এমন কোনো জিনিষের সৃষ্টি হইয়া থাকে, যাহা লইয়া বাঙালি যথার্থ গৌরব করিতে পারে, তাহা বাংলাসাহিত্য। তাহার একটা প্রধান কারণ, বাংলাসাহিত্য সরকারের নেমক খায় নাই। পূর্ব্বে প্রত্যেক বাংলাবই সরকার তিনখানি করিয়া কিনিতেন, শুনিতে পাই এখন মূল্য দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। গবর্মেণ্টের উপাধি, পুরস্কার, প্রসাদের প্রলোভন বাংলাসাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই বলিয়াই, এই সাহিত্য বাঙালির স্বাধীন আনন্দ-উৎস হইতে উৎসারিত বলিয়াই, আমরা এই সাহিত্যের মধ্য হইতে এমন বল পাইতেছি। হয় ত গণনায় বাংলাভাষায় উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থসংখ্যা অধিক না হইতে পারে, হয় ত বিষয়বৈচিত্র্যে এ সাহিত্য অন্যান্য সম্পৎশালী সাহিত্যের সহিত তুলনীয় নহে, কিন্তু তবু ইহাকে আমরা বর্ত্তমান অসম্পূর্ণতা অতিক্রম করিয়া বড় করিয়া দেখিতে পাই, কারণ, ইহা আমাদের নিজের শক্তি হইতে, নিজের অন্তরের মধ্য হইতে উদ্ভূত হইতেছে। এ ক্ষীণ হউক্ দীন হউক্, এ রাজার প্রশ্রয়ের প্রত্যাশী নহে, আমাদেরই প্রাণ ইহাকে প্রাণ জোগাইতেছে। অপর পক্ষে, আমাদের বাংলাবইগুলির প্রতি ন্যূনাধিকপরিমাণে অনেকদিন হইতেই সরকারের গুরুহস্তের ভার পড়িয়াছে, এই রাজপ্রসাদের প্রভাবে স্কুলবইগুলির কিরূপ শ্রী বাহির হইতেছে, তাহা কাহারো অগোচর নাই।

এই যে স্বাধীন বাংলাসাহিত্য, যাহার মধ্যে বাঙালী নিজের প্রকৃত শক্তি যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছে, এই সাহিত্যই নাড়িজালের মত বাংলার পূর্ব্বপশ্চিম, উত্তরদক্ষিণকে এক বন্ধনে বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে এক চেতনা, এক প্রাণ সঞ্চার করিয়া রাখিতেছে;

যদি আমাদের দেশে স্বদেশীসভাস্থাপন হয়, তবে বাংলাসাহিত্যের অভাবমোচন, বাংলা-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন সভাগণের একটি বিশেষ কার্য্য হইবে। বাংলাভাষা অবলম্বন করিয়া ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে দেশে জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা তাঁহা-দিগকে করিতে হইবে। ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, বাংলাসাহিত্য যত উন্নত-সতেজ, যতই সম্পূর্ণ হইবে, ততই এই সাহিত্যই বাঙালীজাতিকে এক করিয়া ধারণ করিবার অনশ্বর আধার হইবে। বৈষ্ণবের গান, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশিরামদাসের মহা-ভারত আজ পর্য্যন্ত এই কাজ করিয়া আসিয়াছে।

আমি জানি, সমস্ত বাংলাদেশ একমুহূর্ত্তে একত্র হইয়া আপনার নায়ক নির্ব্বাচনপূর্ব্বক আপনার কাজে প্রবৃত্ত হইবে, এমন আশা করা যায় না। এখন আর বাদবিবাদ-তর্ক-বিতর্ক না করিয়া আমরা যে কয়জনেই উৎসাহ অনুভব করি, প্রয়োজন স্বীকার করি, সেই পাঁচদশ জনেই মিলিয়া আমরা আপনাদের অধিনায়ক নির্ব্বাচন করিব, তাঁহার নিয়োগ-ক্রমে জীবনযাত্রা নিয়মিত করিব, কর্ত্তব্য পালন করিব, এবং সাধ্যমতে আপনার পরি-বার, প্রতিবেশী ও পল্লিকে লইয়া সুখস্বাস্থ্য-শিক্ষাবিধানসম্বন্ধে একটি স্বকীয় শাসনজাল বিস্তার করিব। এই প্রত্যেক দলের নিজের পাঠশালা, পুস্তকালয়, ব্যায়ামাগার, ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির বিক্রয়ভাণ্ডার (Co-operative Store), ঔষধালয়, সঞ্চয়-ব্যাঙ্ক, সালিশ-নিষ্পত্তির সভা ও নির্দ্দোষ আমোদের মিলন-গৃহ থাকিবে।

এম্‌নি করিয়া যদি আপাতত খণ্ডখণ্ড-ভাবে দেশের নানাস্থানে এইরূপ একএকটি কর্ত্তৃসভা স্থাপিত হইতে থাকে, তবে ক্রমে একদিন এই সমস্ত খণ্ডসভাগুলিকে যোগ-সূত্রে এক করিয়া তুলিয়া একটি বিশ্ববঙ্গ-প্রতিনিধিসভা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

আমরা এই সময়ে এই উপলক্ষ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে বাংলার ঐক্যসাধনযজ্ঞে বিশেষভাবে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা পরের দিকে না তাকাইয়া, নিজেকে পরের কাছে প্রচার না করিয়া নিজের সাধ্যমত স্বদেশের পরিচয়লাভ ও তাহার জ্ঞানভাণ্ডার পূরণ করিতেছেন। এই পরিষৎকে জেলায় জেলায় আপনার শাখাসভা স্থাপন করিতে হইবে—এবং পর্য্যায়ক্রমে একএকটি জেলায় গিয়া পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন করিতে হইবে আমাদের চিন্তার ঐক্য, ভাবের ঐক্য, ভাষার ঐক্য, সাহিত্যের ঐক্য সম্বন্ধে সমস্ত দেশকে সচেতন করিবার—এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আপন স্বাধীন কর্ত্তব্য পালন করিবার ভার সাহিত্য-পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন। এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে—এখন সমস্ত দেশকে নিজের আনু-কূল্যে আহ্বান করিবার জন্য তাঁহাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

যখন দেখা যাইতেছে, বাহির হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা নিরত সতর্ক রহিয়াছে, তখন তাহার প্রতিকারের জন্য নানারূপে কেবলি দল বাঁধিবার দিকে আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে নিযুক্ত করিতে হইবে।

যে গুণে মানুষকে একত্র করে, তাহার

মধ্যে একটা প্রধান গুণ বাধ্যতা। কেবলি অন্যকে খাটো করিবার চেষ্টা, তাহার ত্রুটি ধরা, নিজেকে কাহারো চেয়ে ন্যূন মনে না করা, নিজের একটা মত অনাদৃত হইলেই অথবা নিজের একটুখানি সুবিধার ব্যাঘাত হইলেই দল ছাড়িয়া আসিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার প্রয়াস—এইগুলিই সেই সয়তানের প্রদত্ত বিষ, যাহা মানুষকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেয়, যজ্ঞ নষ্ট করে। ঐক্যরক্ষার জন্য আমাদিগকে অযোগ্যের কর্তৃত্বও স্বীকার করিতে হইবে—ইহাতে মহান্ সঙ্কল্পের নিকট নত হওয়া হয়, অযোগ্যতার নিকট নহে। বাঙালীকে ক্ষুদ্র আত্মাভিমান দমন করিয়া নানারূপে বাধ্যতার চর্চ্চা করিতে হইবে, নিজে প্রধান হইবার চেষ্টা মন হইতে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া অন্যকে প্রধান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সর্ব্বদাই অন্যকে সন্দেহ করিয়া, অবিশ্বাস করিয়া, উপহাস করিয়া তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না দিয়া বরঞ্চ নম্রভাবে বিনা বাক্যব্যয়ে ঠকিবার জন্যও প্রস্তুত হইতে হইবে। সম্প্রতি এই কঠিন সাধনা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে—আপনাকে খর্ব্ব করিয়া আপনাদিগকে বড় করিবার এই সাধনা, গর্ব্বকে বিসর্জ্জন দিয়া গৌরবকে আশ্রয় করিবার এই সাধনা—ইহা যখন আমাদের সিদ্ধ হইবে, তখন আমরা সর্ব্বপ্রকার কর্তৃত্বের যথার্থরূপে যোগ্য হইব। ইহাও নিশ্চিত, যথার্থ যোগ্যতাকে পৃথিবীতে কোন শক্তিই প্রতিরোধ করিতে পারে না। আমরা যখন কর্তৃত্বের ক্ষমতা লাভ করিব, তখন আমরা দাসত্ব করিব না—তা আমাদের প্রভু যত বড়ই প্রবল হউন্। জল যখন জমিয়া কঠিন হয়, তখন সে লোহার পাইপ্‌কেও ফাটাইয়া ফেলে। আজ আমরা জলের মত তরল আছি, যন্ত্রীর ইচ্ছামত যন্ত্রের তাড়নায় লোহার কলের মধ্যে শতশত শাখাপ্রশাখায় ধাবিত হইতেছি—জমাট বাঁধিবার শক্তি জন্মিলেই লোহার বাঁধনকে হার মানিতেই হইবে।

আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি, তবে নৈরাশ্যের লেশমাত্র কারণ দেখি না। বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে, এ কথা আমরা কোনোমতেই স্বীকার করিব না। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখনই আমরা সচেতনভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্ব্বপশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন, এই পূর্ব্বপশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণবাম অংশের ন্যায়, একই পুরাতন রক্তস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরা-উপশিরায় প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে; এই পূর্ব্বপশ্চিম, জননীর বামদক্ষিণ স্তনের ন্যায়, চিরদিন বাঙালির সন্তানকে পালন করিয়াছে। আমাদের কিছুতে পৃথক্ করিতে পারে, এ ভয় যদি আমাদের জন্মে, তবে সে ভয়ের কারণ নিশ্চয়ই আমাদেরই মধ্যে আছে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের চেষ্টা ছাড়া আর কোন কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা হইতে পারে না। কর্তৃপক্ষ আমাদের একটা-কিছু করিলেন বা না করিলেন বলিয়াই অমনি যদি আমাদের সকলদিকে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল বলিয়া আশঙ্কা করি, তবে কোন কৌশললব্ধ সুযোগে, কোন প্রার্থনালব্ধ অনুগ্রহে

আমাদিগকে অধিকদিন রক্ষা করিতে পারিবে না। ঈশ্বর আমাদের নিজের হাতে যাহা দিয়াছেন, তাহার দিকে যদি তাকাইয়া দেখি, তবে দেখিব, তাহা যথেষ্ট এবং তাহাই যথার্থ। মাটির নীচে যদি-বা তিনি আমাদের জন্য গুপ্তধন না দিয়া থাকেন, তবু আমাদের মাটির মধ্যে সেই শক্তিটুকু দিয়াছেন, যাহাতে বিধিমত কর্ষণ করিলে ফললাভ হইতে কখনই বঞ্চিত হইব না। বাহির হইতে সুবিধা এবং সম্মান যখন হাত বাড়াইলেই পাওয়া যাইবে না, তখনি ঘরের মধ্যে যে চিরসহিষ্ণু চিরন্তন প্রেম লক্ষ্মীছাড়াদের গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনের জন্য গোধূলির অন্ধকারে পথ তাকাইয়া আছে, তাহার মূল্য বুঝিব। তখন মাতৃভাষায় ভ্রাতৃগণের সহিত সুখদুঃখ-লাভক্ষতি-আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিব—এবং সেই শুভদিন যখন আসিবে, তখনি ব্রিটিশ শাসনকে বলিব ধন্য—তখনি অনুভব করিব, বিদেশীর এই রাজত্ব বিধাতারই মঙ্গলবিধান। আমরা যাচিত ও অযাচিত যে-কোনো অনুগ্রহ পাইয়াছি, তাহা যেন ক্রমে আমাদের অঞ্জলি হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে এবং তাহা যেন স্বচেষ্টায় নিজে অর্জ্জন করিয়া লইবার অবকাশ পাই। আমরা প্রশ্রয় চাহি না:—প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। আমাদের নিদ্রার সহায়তা কেহ করিয়ো না—আরাম আমাদের জন্য নহে, পরবশতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়ো না— বিধাতার রুদ্রমূর্ত্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ! জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একইমাত্র উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও অভাব; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।

প্রেমের কামনা।

১

আমি ত বুঝি না, তারে কেন ভালবাসি,
সেই হাসি—সেই মুখ,
সেই প্রেমভরা বুক:
যে বলে বলুক রূপে নাহি জ্যোৎস্নাহাসি,
আমি ভালবাসি তার শ্যাম শোভারাশি

২

চাহি না ফুলের রূপ, জ্যোৎস্না হাসিময়,
ফুল ফেলে—জ্যোৎস্না ফেলে,
ভালবাসি অবহেলে,
নব নীরদের ছবি, শ্যাম কিশলয়,
তাই ও রূপের কাছে কোন রূপ নয়।

৩

যত দেখি, রূপ তত উথলে নয়নে ;
প্রেম যেন মূর্ত্ত হ'য়ে,
আছে তারি রূপ ল'য়ে,
তাই সে আনন্দচ্ছবি সদা জাগে মনে,
প্রীতির নির্ঝর ঝরে তার দরশনে ।

৪

চিরপরিচিত কোন সঙ্গীত মধুর,—
যেমন পাগল করে,
যেমন মানস হরে,
তেমনি সে রূপে বুঝি আছে কোন সুর,
তিরপিত করে মোর পরাণ বিধুর ।

৫

যেমন বিশ্বের আলো, বাতাস যেমন,
তেমনি গো রূপ তার
ব্যাপি' মোর চারিধার,
তেমনি উদার আর প্রশান্ত তেমন,
তাই ভালবাসি তায় থাকিতে মগন ।

৬

সাধ যায়—ফুল হ'য়ে হই উপচার ;
ফুটে থাকি তারি তরে,
তেমনি আনন্দভরে ;
আপনারে করে' রাখি পূজা-উপহার,
তাতেই কৃতার্থ করি জীবন আমার ।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ।

দেশের মাটি।

(বাউলের সুর)

ও আমার দেশের মাটি,
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর
(তোমাতে বিশ্বমায়ের)
আঁচল পাতা।
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ঐ শ্যামলবরণ কোমলমূর্ত্তি
মর্ম্মে গাঁথা—
তোমার কোলে জনম আমার,
মরণ তোমার বুকে।
তোমার 'পরেই খেলা আমার
দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা
মাতার মাতা।
অনেক তোমার খেয়েছি গো,
অনেক নিয়েছি মা,
তবু, জানিনে যে কিবা তোমায়
দিয়েছি মা!
আমার জনম গেল মিছে কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে,
ওমা বৃথা আমার শক্তি দিলে শক্তিদাতা!

সংখ্যা	মোট রচনা	সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের রচনা	ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য সদস্য-দের রচনা	অন্যান্য লেখকদের রচনা	অশনাক্ত/ নামহীন/ অস্বাক্ষরিত রচনা
বৈশাখ-১৩১২	৭	২	১	৪	—
জ্যৈষ্ঠ-১৩১২	৭	২	১	৪	—
আষাঢ়-১৩১২	১০	২	১	৭	—
শ্রাবণ-১৩১২	৮	১	২	৫	—
ভাদ্র-১৩১২	৯	২	২	৫	—
আশ্বিন-১৩১২	১০	৪	২	৪	—
কার্ত্তিক-১৩১২	১৯	৪	১	১৩	১
অগ্রহায়ণ-১৩১২	১২	৩	১	৮	—
পৌষ-১৩১২	৮	২	১	৫	—
মাঘ-১৩১২	৯	৩	২	৪	—
ফাল্গুন-১৩১২	১২	২	২	৮	—
চৈত্র-১৩১২	৯	১	২	৬	—
মোট	১২০	২৮	১৮	৭৩	১